অধ্যায় ৩

# মানব শারীরতত্ত্ব : পরিপাক ও শোষণ
# Human Physiology : Digestion & Absorption

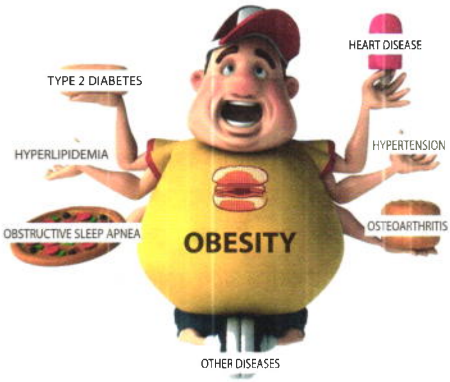


**প্রধান শব্দাবলি (Key words)**

- ❒ পরিপাক
- ❒ গ্যাস্ট্রিন
- ❒ পিত্তরস
- ❒ BMI
- ❒ টায়ালিন
- ❒ স্থূলতা

মানবদেহের বিভিন্ন জৈবনিক কাজ পরিচালনা, শক্তি সরবরাহ, দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা এবং রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে **পুষ্টি** (nutrition)। **খাদ্য** (food)-ই মানবদেহে পুষ্টির যোগান দেয়। পরিপাক প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রথমে সরল দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পরে কোষে প্রবেশের উপযোগী হয়। সবশেষে রক্ত এ পরিপাককৃত খাদ্যকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে।

| এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব | পাঠ পরিকল্পনা | |
|---|---|---|
| ❒ মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাকের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া | পাঠ ১ | মুখগহ্বরে সংঘটিত খাদ্য পরিপাক |
| ❒ পাকস্থলির বিভিন্ন অংশে সংঘটিত যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিপাকের মধ্যে সম্পর্ক | পাঠ ২ | পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাক |
| ❒ যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা | পাঠ ৩ | যকৃতের কাজ |
| ❒ বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্রম | পাঠ ৪ | অগ্ন্যাশয়ের কাজ |
| ❒ গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে স্নায়ুতন্ত্র ও গ্যাস্ট্রিক হরমোনের ভূমিকা | পাঠ ৫ | পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা |
| ❒ খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে ক্ষুদ্রান্ত্রের বিভিন্ন অংশের প্রধান কাজ | পাঠ ৬ | ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক |
| ❒ ক্ষুদ্রান্ত্রের লুমেন থেকে রক্তজালিকা এবং ভিলাই পর্যন্ত পরিপাককৃত দ্রব্যের শোষণ | পাঠ ৭ | ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য উপাদানের শোষণ |
| | পাঠ ৮ | শোষিত খাদ্যসার পরিবহন ও এর পরিণতি |
| ❒ বৃহদন্ত্রের কাজ | পাঠ ৯ | বৃহদন্ত্রের কাজ |
| ❒ ব্যবহারিক : পরিপাক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কোষসমূহ শনাক্তকরণ ও চিত্র অঙ্কন | পাঠ ১০ | ব্যবহারিক : যকৃত, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ |
| ❒ স্থূলতার ধারণা, কারণ ও প্রতিরোধ | পাঠ ১১ | স্থূলতা |

## পরিপাক (Digestion)

**যে প্রক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তু বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে ও এনজাইমের সহায়তায় ভেঙ্গে দ্রবণীয় সরল ও তরল এবং দেহকোষের গ্রহণ উপযোগী ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে।** যে আঙ্গিক তন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর পরিপাক ও শোষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে **পৌষ্টিকতন্ত্র** (digestive system) বলে।

পরিপাক প্রক্রিয়া কতকগুলো ধারাবাহিক **যান্ত্রিক** ও **রাসায়নিক** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

**১. যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical Digestion) :** পরিপাকের সময় যে প্রক্রিয়ায় গৃহীত খাদ্যের পরিশোষণযোগ্য অংশ চিবানো, গলাধঃকরণ ও পৌষ্টিকনালি অতিক্রমের সময় নালির বিভিন্ন অংশের পেশল সঞ্চালনের ফলে গাঠনিক ভাঙনের (physical breakdown) মাধ্যমে অতি ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হয়ে এনজাইমের ক্রিয়াতলের বৃদ্ধি ঘটায় (increases the surface area for the action of the digestive enzymes) তাকে **যান্ত্রিক পরিপাক** বলে।

**২. রাসায়নিক পরিপাক (Chemical Digestion) :** পরিপাকের সময় গৃহীত খাদ্যের পরিপাকযোগ্য অংশ যান্ত্রিক পরিপাকের পরপরই মুখ, পাকস্থলি ও অন্ত্রে এসিড, ক্ষার ও এনজাইমের সহায়তায় রাসায়নিক ভাঙনের (chemical breakdown) মাধ্যমে দেহকোষের গ্রহণীয় উপাদানে পরিণত হওয়াকে **রাসায়নিক পরিপাক** বলে।

## মানব পৌষ্টিকতন্ত্র / পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ (Different Parts of Human Digestive System)

বেঁচে থাকার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার গ্রহণ করি। আমাদের গ্রহণ করা অধিকাংশ খাবার (শর্করা, আমিষ, স্নেহদ্রব্য) বড় জটিল অণু হিসেবে গৃহীত হয় যা ক্ষুদ্রতম অণুতে বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ **পরিপাক** না হওয়া পর্যন্ত দেহের কোনো কাজে আসে না। খাদ্য পরিপাক উপযোগী কতগুলো অঙ্গ ও গ্রন্থির সমন্বয়ে মানুষের **পৌষ্টিকতন্ত্র** গঠিত। এটি **পৌষ্টিকনালি** ও **পৌষ্টিকগ্রন্থি** নিয়ে গঠিত।

**পৌষ্টিকনালি (Digestive Tract) :** **মুখ** থেকে **পায়ু** পর্যন্ত বিস্তৃত পেশিবহুল প্যাঁচানো নালিটির নাম **পৌষ্টিকনালি**। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৮-১০ মিটার। এতে মুখ, গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র ও পায়ু থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা–ডিওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম। বৃহদন্ত্রও তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা-সিকাম, কোলন ও মলাশয়।

**পৌষ্টিকগ্রন্থি (Digestive Glands) :** পরিপাকরস ক্ষরণকারী গ্রন্থিগুলোকে **পৌষ্টিকগ্রন্থি** বলে। মানুষের দেহে পাঁচ প্রকারের পৌষ্টিকগ্রন্থি থাকে, যথা-লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি ও আন্ত্রিকগ্রন্থি।

মানব পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নিচের ছক ও চিত্রের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো–

**পৌষ্টিকতন্ত্র**

**পৌষ্টিকনালি**

১. মুখছিদ্র
২. মুখবিবর বা মুখগহ্বর
৩. গলবিল (দৈর্ঘ্য প্রায় ১২.৫ সেমি)
৪. অন্ননালি (দৈর্ঘ্য ২৩–২৫ সেমি)
৫. পাকস্থলি (দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ সেমি, প্রস্থ প্রায় ১৫ সেমি)
   ক. কার্ডিয়া
   খ. ফানডাস
   গ. কর্পাস
   ঘ. অ্যান্ট্রাম
   ঙ. পাইলোরাস
৬. ক্ষুদ্রান্ত্র (দৈর্ঘ্য প্রায় ৬-৭ মিটার)
   ক. ডিওডেনাম
   খ. জেজুনাম
   গ. ইলিয়াম
৭. বৃহদন্ত্র (দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৫ মিটার)
   ক. সিকাম
   খ. কোলন
      i. উর্ধ্বগামী
      ii. অনুপ্রস্থ
      iii. নিম্নগামী
      iv. সিগময়েড
   গ. মলাশয়
৮. পায়ু

**পৌষ্টিকগ্রন্থি**

১. লালাগ্রন্থি
২. যকৃত
৩. অগ্ন্যাশয়
৪. গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি
৫. আন্ত্রিকগ্রন্থি

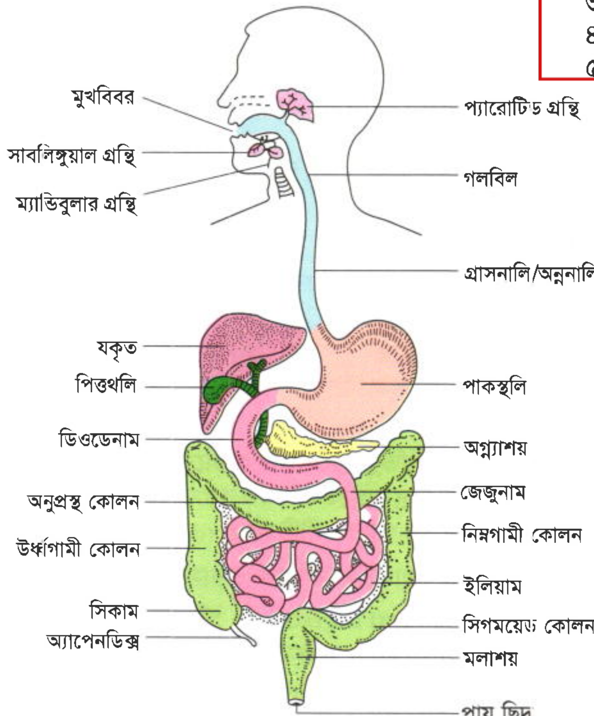


চিত্র ৩.২ : মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ (চিত্রানুগ)

**মানুষের পৌষ্টিকনালিতে বিভিন্ন ধরনের জটিল খাদ্যের পরিপাক নিম্নোক্ত ৬টি ধাপে সম্পন্ন হয়।**

১. খাদ্য ও পানি গলাধঃকরণ (Ingestion of food & water)।
২. পৌষ্টিকনালিতে খাদ্যের সঞ্চালন (Movement of food along the alimentary canal)।
৩. খাদ্যের যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical digestion of food)।
৪. খাদ্যের রাসায়নিক পরিপাক (Chemical digestion of food)।
৫. পরিপাককৃত খাদ্য ও পানি পরিশোষণ (Absorption of digested food & water)।
৬. বর্জ্যবস্তু নিষ্কাশন (Elimination of undigested materials)।

মানুষ **সর্বভুক** (omnivorus)। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উভয় ধরনের খাদ্যই এরা গ্রহণ করে থাকে। এদের খাদ্য তালিকায় ছয়টি খাদ্য উপাদানই রয়েছে। তবে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্য জটিল হওয়ায় এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয়। বাকি তিনটি খাদ্যোপাদান, যেমন–ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি কোষে সরাসরি গৃহীত হওয়ায় এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। **সঠিক পরিমাণ শর্করা, আমিষ, স্নেহদ্রব্য, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি নিয়ে গঠিত যে খাদ্য কোনো ব্যক্তির স্বাভাবিক পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে, তাকে সুষম খাদ্য** (balanced diet) বলে। নিচে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের প্রতিদিনের সুষম খাদ্যের তালিকা দেয়া হলো।

| খাদ্য উপাদান | পরিমাণ | প্রধান কাজ |
|---|---|---|
| ১. শর্করা (Carbohydrate) | ৪১৫–৬০০ গ্রাম | তাপশক্তি উৎপাদন ও দেহে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি। |
| ২. আমিষ (Protein) | ১০০–১৫০ গ্রাম | দেহের বৃদ্ধি, কোষগঠন, ক্ষয়পূরণ, এনজাইম ও হরমোন উৎপাদন। |
| ৩. স্নেহদ্রব্য (Lipid) | ৫০–৫৫ গ্রাম | তাপশক্তি উৎপাদন ও দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ। |
| ৪. ভিটামিন (Vitamin) | ৫৫০০–৫৬০০ মিলিগ্রাম | পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো। |
| ৫. খনিজ লবণ (Mineral) | ৮–১০ গ্রাম | স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা। [DAT 24-25] |
| ৬. পানি (Water) | ২–৩ লিটার | প্রোটোপ্লাজমকে সিক্ত ও সজীব রাখা এবং কোষের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ। |

## মানুষের খাদ্য পরিপাক প্রণালী (Process of Human Digestion)

মানুষে অধিকাংশ খাদ্য (শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্য) বৃহৎ অণু হিসেবে মুখগহ্বরে গৃহীত হয়। খাদ্যবস্তুর এমন বৃহত্তর জটিল অণুগুলো ক্ষুদ্রতম অণুতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত শোষণ উপযোগী হয় না, তাই মানবদেহের কোন কাজে আসে না। সেজন্য শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্য এ তিনটি খাদ্যের উপাদানকে পরিপাক করতে হয়। নিচে খাদ্য উপাদানের নাম, পরিপাককারী এনজাইম ও উৎপন্ন দ্রব্য ছক আকারে উপস্থাপিত হলো।

| খাদ্যের উপাদান | প্রধান এনজাইম | উৎপন্ন সরল উপাদান |
|---|---|---|
| শর্করা (Carbohydrate) (ভাত, রুটি, চিনি, শাক-সবজি) | অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম (Amylolytic enzymes) (টায়ালিন, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ) | গ্লুকোজ |
| আমিষ (Protein) (মাছ, মাংস, ডিম, ডাল) | প্রোটিওলাইটিক এনজাইম (Proteolytic enzymes) (পেপসিন, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন) [MAT 21-22, 20-21 DAT 17-18, 16-17] | অ্যামিনো এসিড |
| স্নেহদ্রব্য (Lipid) (ভোজ্যতেল, ঘি, মাখন, প্রাণিজ চর্বি) | লাইপোলাইটিক এনজাইম (Lipolytic enzymes) (পাকস্থলিয় ও আন্ত্রিক লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ, কোলেস্টেরল এস্টারেজ, লেসিথিনেজ) | ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল |

## মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাক (Digestion of Food in Buccal Cavity)

মানুষের পৌষ্টিকনালি **মুখ** থেকে **পায়ু** পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ৮–১০ মিটার লম্বা। পৌষ্টিকনালির শুরু মুখ থেকে। এটি নাসাছিদ্রের নিচে অবস্থিত এক আড়াআড়ি ছিদ্র যা একটি করে উপরের ও নিচের ঠোঁটে বেষ্টিত। মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু **মুখগহ্বর** বা **মুখবিবর**-এ প্রবেশ করে।

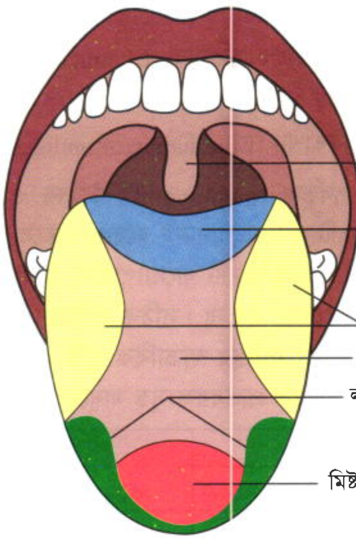

চিত্র ৩.৩ : জিহ্বার পৃষ্ঠতলে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার স্বাদকুঁড়ি

মুখপরবর্তী গহ্বরটি **মুখগহ্বর**। একে ঘিরে এবং এর ভিতরে কয়েকটি অঙ্গ অবস্থিত। এসব অঙ্গের মধ্যে গাল, দাঁত, মাড়ি, জিহ্বা ও তালু প্রধান।

মুখগহ্বরের উর্ধ্বপ্রাচীর তালুর অস্থি ও পেশি দিয়ে, সামনের প্রাচীর ঠোঁটের পেশি দিয়ে এবং পাশের প্রাচীর গালের পেশি দিয়ে গঠিত। তালুর অগ্রভাগ অস্থিনির্মিত ও শক্ত (hard palate), পশ্চাৎভাগ পেশল ও নরম (soft palate)। কোমল তালুর পিছনের প্রান্তের মধ্যভাগ থেকে একটি পেশল **আলজিভ** (uvula) মুখগহ্বরে ঝুলে থাকে।

নিম্ন চোয়ালের অস্থির সাথে **জিহ্বা** যুক্ত থাকে। এর পৃষ্ঠতলে থাকে ফ্লাস্ক আকৃতির **স্বাদকুঁড়ি** (taste buds)। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জিহ্বায় সাধারণত ২০০০ থেকে ১০,০০০ স্বাদকুঁড়ি থাকে। স্বাদকুঁড়িগুলো খাদ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বস্তুর প্রতি সংবেদনশীল, কিন্তু কিছু বিশেষ জায়গা বিশেষ স্বাদ ভালো গ্রহণ করে। যেমন-জিহ্বার অগ্রপ্রান্তে **মিষ্টতা** (sweetness), অগ্রভাগের দুপাশে **লবণাক্ততা** (saltness), পশ্চাৎভাগের দুপাশে **টক** বা **অম্লতা** (sourness), পিছন দিকে **তিক্ততা** (bitterness) এবং কেন্দ্রীয় অংশ **সুস্বাদ** (umami) গ্রহণ করে। ঝাল জাতীয় খাবারের জন্য কোন স্বাদকুঁড়ি নেই। তবে ঝালজাতীয় খাদ্য জিহ্বায় **জ্বালা** (irritation) ঘটায়। স্বাদকুঁড়িগুলো কোনো স্থায়ী গঠন নয় বরং পাঁচ থেকে দশ দিনের মধ্যে এগুলো নষ্ট বা ছিন্ন হয়ে যায় এবং নতুন গঠন দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়।

চিত্র ৩.৪ : একটি স্বাদকুঁড়ি

মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে তিনজোড়া **লালাগ্রন্থি** (salivary gland) অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে দুপাশের কানের নিচে **প্যারোটিড গ্রন্থি** (parotid gland), নিচের চোয়ালের ভিতর দিকে ম্যান্ডিবল-এর নিচে **সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি** (submandibular gland) এবং জিহ্বার তলায় **সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি** (sublingual gland)। গ্রন্থিগুলো রস ক্ষরণকারী এবং এপিথেলিয়ামে আবৃত গোল বা ডিম্বাকার **থলি** (sac) বিশেষ। থলির প্রাচীরে যে **সেরাস কোষ** ও **মিউকাস কোষ** রয়েছে তা থেকে রস ক্ষরিত হয়। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **লালা** (saliva) কিছুটা অম্লীয় এবং এর অধিকাংশই পানি (৯৫.৫%-৯৯.৫%)। একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন ১২০০–১৫০০ মিলিলিটার লালা ক্ষরণ করে।

**মুখগহ্বরে খাদ্যবস্তু দুভাবে পরিপাক হয়– যান্ত্রিক (mechanical) ও রাসায়নিক (chemical)।**

### যান্ত্রিক পরিপাক

- সামান্যতম স্বাদ, গন্ধ ও খাদ্য গ্রহণে স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্ক যে সংকেত পায় তার প্রেক্ষিতে মস্তিষ্ক লালাগ্রন্থিগুলোতে **লালা** ক্ষরণের বার্তা পাঠায়। লালা মূলত পানিতে গঠিত এবং খাদ্যকে এমনভাবে নরম ও মসৃণ করে যাতে দাঁতের কাজ দ্রুত ও সহজ হয়। তা ছাড়া গৃহীত খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া থাকলে তাও বিনষ্ট হয়।

- চার ধরনের দাঁত যেমন– **কর্তন** (Incisor), **ছেদন** (Canine), **অগ্রপেষণ** (Pre-molar) ও **পেষণ** (Molar)-এর নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে বড় খাদ্যখণ্ড কাটা-ছেঁড়া, পেষণ-নিষ্পেষণ শেষে হজম উপযোগী ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হয়।
- জিহ্বা নড়া-চড়া ও সঙ্কোচন-প্রসারণক্ষম পেশল অংশ। এটি স্বাদ নেওয়া ছাড়াও দাঁতে আটকে থাকা খাদ্যকণা সরাতে, মুখের চারপাশে ঘুরিয়ে বিভিন্ন দাঁতের নিচে পৌঁছাতে, লালা মিশ্রণে এবং সবশেষে গিলতে সাহায্য করে।
- যান্ত্রিক পরিপাকের সময় খাদ্যদ্রব্য নিষ্পেষিত হয়ে নরম **খাদ্যমণ্ড** (bolus)-তে পরিণত হয়। জিহ্বার উপরতল যখন খাদ্যমণ্ডকে **শক্ত তালুর** (hard palate) বিপরীতে রেখে চাপ দেয় তখন খাদ্যমণ্ড পিছন দিকে যেতে বাধ্য হয়।
- পিছনে **কোমল তালু** (soft palate) থাকায় খাদ্যমণ্ড নাসাছিদ্রপথে প্রবেশে বাধা পায়। [DAT: 19-20]
- কোমল তালু পার হলেই খাবার গলবিলে এসে পৌঁছায়। গলবিল থেকে দুটি নালি চলে গেছে– একটি **শ্বাসনালি** (trachea), অন্যটি **অন্ননালি** (oesophagus)।
- জিহ্বার গোড়ার দিকে শ্বাসনালির অংশে ছোট উদগত অংশ হিসেবে অবস্থিত তরুণাস্থি নির্মিত **এপিগ্লটিস** (epiglottis) খাদ্য গলাধঃকরণের সময় স্বরযন্ত্রের মুখ (laryngeal inlet) ঢেকে দিয়ে খাদ্যকে শ্বাসনালিতে প্রবেশে বাধা দেয়, তাই খাদ্যবস্তু অন্ননালিতে প্রবেশ করে।

## রাসায়নিক পরিপাক

**শর্করা পরিপাক :** লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে **টায়ালিন** ও **মল্টেজ** (অল্প) নামে শর্করাবিশ্লেষী এনজাইম পাওয়া যায়। এগুলো জটিল শর্করাকে মল্টোজ এবং সামান্য মল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে। টায়ালিনের ক্রিয়া মুখগহ্বরে শুরু হলেও এর পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয় পাকস্থলিতে।

RMDAC

১. জটিল শর্করা $\xrightarrow{\text{টায়ালিন}}$ মল্টোজ। ২. মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ

**আমিষ পরিপাক :** মুখগহ্বরের লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে প্রোটিওলাইটিক (আমিষ বিশ্লেষী) এনজাইম না থাকায় এখানে আমিষ জাতীয় খাদ্যের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেনা।

**স্নেহ পরিপাক :** মুখগহ্বরে স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাকের জন্য কোন এনজাইম না থাকায় এধরনের খাদ্যের পরিপাকও ঘটেনা।

লালামিশ্রিত, চর্বিত ও আংশিক পরিপাককৃত শর্করা গলবিল ও অন্ননালির মাধ্যমে পাকস্থলিতে পৌঁছায়।

## দাঁত ও দন্তসংকেত (Teeth & Dental Formula)

মানুষের মুখগহ্বরের উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়ালে অবস্থিত **অ্যালভিওলাই** নামক গর্তে দাঁতগুলো দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। মানুষের দাঁত **ডাইফায়োডন্ট** (diphyodont) ধরনের কারণ এদের দাঁত **দুবার গজায়**। দুই থেকে ছয় বছরের মধ্যে **বিশটি দুধ দাঁত** (milk teeth) গজায়। এগুলো আট থেকে দশ বছরের মধ্যেই একে একে পড়ে গেলে **স্থায়ী দাঁত** (permanent teeth) দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। আঠারো থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যে সাধারণত দুই চোয়ালে সর্বমোট **বত্রিশটি দাঁত** পরিলক্ষিত হয়। [DAT 24-25]

## দাঁতের প্রকারভেদ

মানুষের চোয়ালে চার ধরনের দাঁত থাকে। এগুলো হচ্ছে-

i. কর্তন দাঁত (Incisors) : প্রতি চোয়ালের সামনের ধারালো ৪টি দাঁত যা খাদ্য কাটার কাজে সাহায্য করে।

ii. ছেদন দাঁত (Canine) : প্রতি চোয়ালের প্রতি পাশে কর্তন দাঁতের পিছনে একটি করে চোখা দাঁত যা খাদ্য ছেঁড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

iii. অগ্রপেষণ দাঁত (Pre-molar) : প্রতি চোয়ালের প্রতি পাশে ছেদন দাঁতের পিছনে দুটি করে এ ধরনের দাঁত থাকে। এগুলোর ঊর্ধ্বপ্রান্ত চওড়া ও খাঁজকাটা কাস্পযুক্ত। এদের কাজ খাদ্যবস্তু চর্বন ও পেষণ। দুধ দাঁতে এরা থাকে না।

iv. পেষণ দাঁত (Molar) : প্রতি চোয়ালের প্রতি পাশে অগ্রপেষণ দাঁতের পিছনে তিনটি করে এধরনের দাঁত রয়েছে। এদের উর্ধ্বপ্রান্ত অনেক চওড়া ও খাঁজকাটা কাস্পযুক্ত। সর্বশেষ পেষণ দাঁতটি পরে উঠে। একে **আক্কেল দাঁত** (wisdom teeth) বলে। পেষণ দাঁতও খাদ্যবস্তু চর্বন ও পেষণে সাহায্য করে।

### দন্ত সংকেত (Dental Formula)

**স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মোট দাঁতের সংখ্যা ও ধরণ যে সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে দন্ত সংকেত বা ডেন্টাল ফর্মুলা** বলে। প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মানুষের প্রত্যেক চোয়ালের দন্তকোটরে ১৬টি দাঁত থাকে। চোয়ালের সামনে ৪টি **কর্তন** (incisor), এগুলোর দুপাশে ১টি করে **ছেদন** (canine), ছেদনের পাশে দুটি করে **অগ্রপেষণ** (pre-molar) এবং চোয়ালের দুপ্রান্তে রয়েছে ৩টি করে **পেষণ দাঁত** (molar)।

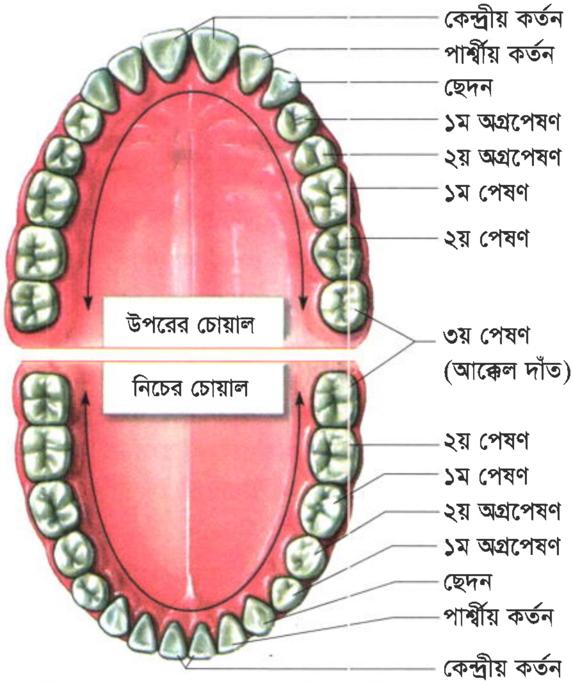

চিত্র ৩. ৫ : মানুষের চোয়ালে দাঁতের বিন্যাস

একটি সরল রেখার উপর ও নিচে বিভিন্ন প্রকার দাঁতের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর লিখে ঐ ধরনের দাঁত প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশে কটি আছে তা লেখা হয়। এর পর প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশের মোট দাঁতের সংখ্যাকে ২ দিয়ে গুণ করে উভয় চোয়ালের দাঁতের সংখ্যা যোগ করলে মোট দাঁতের সংখ্যা পাওয়া যায়। এ সংকেত অনুযায়ী–

[DAT: 24-25, 18-19, 17-18]

**প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দন্ত সংকেত:**

$$\frac{I_2C_1P_2M_3}{I_2C_1P_2M_3} = \frac{8 \times 2}{8 \times 2} = 16 + 16 = 32$$

**পাঁচ-ছয় বছরের শিশুর দন্ত সংকেত :**

$$\frac{I_2C_1P_0M_2}{I_2O_1P_0M_2} = \frac{5 \times 2}{5 \times 2} = 10 + 10 = 20$$

[MAT: 16-17]

## পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাক (Digestion of Food in Stomach)

পাকস্থলিটি ডায়াফ্রামের নিচে উদরের উপরের অংশে অবস্থিত প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া বাঁকানো থলির মতো অংশ। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর দেহে পাকস্থলির ধারণ ক্ষমতা থাকে ৩০ মিলিলিটার (১ আউন্স), বয়ঃসন্ধিকালে হয় ১ লিটার, আর প্রাপ্ত বয়স্কে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১.৫–২ লিটার। পাকস্থলি নিম্নোক্ত পাঁচটি অংশে বিভক্ত–

**১. কার্ডিয়া (Cardia) :** যে অংশে অন্ননালি উন্মুক্ত হয় তা **কার্ডিয়া**। এটি **কার্ডিয়াক স্ফিংটার** (cardiac sphincter) নামক পেশিবলয় ধারণ করে।

**২. ফান্ডাস (Fundus) :** কার্ডিয়ার নিচের ও বাম পাশের গম্বুজাকৃতির উঁচু অংশের নাম **ফান্ডাস**। পরিপাকের সময় সৃষ্ট গ্যাস এখানে জমা থাকে।

**৩. দেহ বা কর্পাস (Body or Corpus) :** এটি পাকস্থলির প্রধান এবং সর্ববৃহৎ অংশ। এখানে খাদ্যের পরিপাক সংঘটিত হয়।

**৪. অ্যান্ট্রাম (Antrum) :** এটি কর্পাসের নিচের বাঁকা অংশ। অন্ত্রে প্রবেশের পূর্বে এখানে খাদ্য সাময়িকভাবে জমা থাকে।

**৫. পাইলোরাস (Pylorus) :** পাকস্থলির যে অংশটি অন্ত্রের ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয় তার নাম **পাইলোরাস**। এটি **পাইলোরিক স্ফিংটার** (pylorus sphincter) নামক পেশিবলয় ধারণ করে।

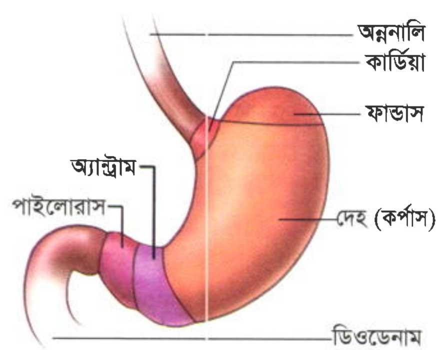

চিত্র ৩.৬ : পাকস্থলির বিভিন্ন অংশ

## যান্ত্রিক পরিপাক

- মুখ থেকে চর্বিত খাদ্য অন্ননালিপথে পাকস্থলিতে এসে ২-৬ ঘন্টাকাল অবস্থান করে। তরল খাদ্য ১৫–৩০ মিনিটের মধ্যে পাকস্থলি খালি করে ক্ষুদ্রান্ত্রে এসে পৌঁছে।
- এসময় প্যারাইটাল কোষ থেকে HCl ক্ষরিত হয়ে খাদ্য বাহিত অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয়।
- মসৃণ পেশির ৩টি স্তর নিয়ে পাকস্থলি গঠিত। পেশিস্তর বিভিন্ন দিকমুখি হওয়ায় পাকস্থলি প্রাচীর নানাদিকে সঞ্চালিত হয়ে (মোচড় দিয়ে, সঙ্কুচিত হয়ে কিংবা চাপা হয়ে) মুখগহ্বর থেকে আসা অর্ধচূর্ণ খাদ্যকে পিষে **পেস্ট** (paste)-এ পরিণত করে।
- এসময় **গ্যাস্ট্রিক জুস** (gastric juice) ক্ষরিত হয়ে পাকস্থলির যান্ত্রিক চাপে পিষ্ট খাদ্যের সঙ্গে মিশে ঘন স্যুপের মতো মিশ্রণে পরিণত হয়। খাদ্যের এ অবস্থা **কাইম** (chyme) বা **মন্ড** নামে পরিচিত। এর উপর গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত বিভিন্ন এনজাইমের পরিপাক কাজ শুরু হয়ে যায়।

## রাসায়নিক পরিপাক

পাকস্থলির প্রাচীর পেশিবহুল এবং **গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি** (gastric gland) সমৃদ্ধ। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এক ধরনের নলাকার গ্রন্থি ও চার ধরনের কোষে গঠিত। প্রত্যেক ধরনের কোষের ক্ষরণ আলাদা। সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির ক্ষরণকে **গ্যাস্ট্রিক জুস** বলে। এর ৯৯.৪৫% পানি। **গ্যাস্ট্রিন** (gastrin) নামক হরমোন এ জুস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

**শর্করা পরিপাক :** পাকস্থলি থেকে শর্করাবিশ্লেষী কোন এনজাইম নিঃসৃত হয় না। ফলে শর্করা জাতীয় খাদ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

**আমিষ পরিপাক :** গ্যাস্ট্রিক জুসে **পেপসিনোজেন** নামক নিষ্ক্রিয় প্রোটিওলাইটিক (আমিষ বিশ্লেষী) এনজাইম থাকে। নিষ্ক্রিয় এনজাইমটি গ্যাস্ট্রিক জুসের HCl-এর সাথে বিক্রিয়া করে **পেপসিন** নামক সক্রিয় এনজাইমে পরিণত হয়। পেপসিন অম্লীয় মাধ্যমে জটিল আমিষের আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটিয়ে **প্রোটিওজ** ও **পেপটোন**-এ পরিণত করে। এছাড়া পাচকরসের **জিলেটিনেজ** নামক এনজাইম **জিলেটিন** (gelatin) নামক আমিষকে আংশিক পরিপাক করে **পেপটোন** ও **পলিপেপটাইড** উৎপন্ন করে। গ্যাস্ট্রিক জুসের **প্রোরেনিন** (prorennin) নামক শিশুদের দুগ্ধ হজমকারী নিষ্ক্রিয় এনজাইম HCl-এর সংস্পর্শে সক্রিয় হয়ে **রেনিন** (rennin) নামক এনজাইমে পরিণত হয়। রেনিন দুগ্ধ প্রোটিনের **কেসিন** (casein) কে ভেঙ্গে প্যারাকেসিনে পরিণত করে। অতঃপর এই প্যারাকেসিন পেপসিনের প্রভাবে পেপটোনে পরিণত হয়।

১. আমিষ + পানি $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ প্রোটিওজ + পেপটোন।

২. দুগ্ধ কেসিন + পানি $\xrightarrow{\text{রেনিন}}$ প্যারাকেসিন।

৩. প্যারাকেসিন $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ পেপটোন।

৪. জিলেটিন $\xrightarrow{\text{জিলেটিনেজ}}$ পেপটোন ও পলিপেপটাইড।

**স্নেহ পরিপাক :** অম্লীয় মাধ্যমে স্নেহ বিশ্লেষকারী এনজাইম কাজ করতে পারে না কিন্তু পাকস্থলিতে **গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ** নামক খুব দুর্বল স্নেহ বিশ্লেষকারী এনজাইম থাকে। লাইপোলাইটিক (স্নেহ বিশ্লেষকারী) এনজাইমের মধ্যে এরা ব্যতিক্রম এ অর্থে যে, এগুলো একমাত্র অম্লীয় মাধ্যমে কাজ করতে সক্ষম। এ এনজাইম কেবল মাখনের চর্বি বা **বাটার ফ্যাট** (butter fat)-এর উপর কাজ করে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। **গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ** বাটার ফ্যাট ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল উৎপন্ন করে।

অর্ধপাচিত এ খাদ্য ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। পাকস্থলির পাইলোরিক প্রান্তে অবস্থিত **স্ফিংক্টার** (sphincter = পেশির বেড়ী যা ছিদ্রপথকে বেষ্টন করে থাকে) পাকস্থলি থেকে ডিওডেনামে খাদ্যের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

**পাকস্থলি নিজেই এনজাইমে পরিপাক হয়ে যায় না। কারণ–**

পাকস্থলির সমগ্র অন্তর্গাত্র **গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা** (এপিথেলিয়াল আবরণ)–য় আবৃত। এ আবরণ HCl, মিউকাস, বিভিন্ন প্রোএনজাইম ও বাইকার্বোনেট ক্ষরণ করে। পাকস্থলি যেন নিজেই হজম হয়ে না যায় সেকারণে নিম্নোক্ত ৫টি প্রক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় :

১. পাকস্থলির অন্তর্গাত্র থেকে নিঃসৃত পুরু **মিউকাস স্তর** HCl এর আক্রমণ রোধকারী ভৌত প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

২. পাকস্থলির অন্তর্গাত্র থেকে ক্ষরিত **বাইকার্বনেট** প্রকৃতপক্ষে একটি ক্ষার এবং এটি HCl কে প্রশমিত করে।
৩. এনজাইম **পেপসিন** প্রথমে **পেপসিনোজেন** নামক প্রোএনজাইম হিসেবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ক্ষরিত হয়। HCl এর সংস্পর্শে এলে এটি সক্রিয় পেপসিনে পরিণত হয়।
৪. পাকস্থলির অন্তঃস্থ এপিথেলিয়ামের কোষগুলো ঘন সংলগ্ন ও দৃঢ় সংবদ্ধ থাকায় HCl কিছুতেই এপিথেলিয়ামের ক্ষতি করতে পারে না।
৫. পাকস্থলির অন্তঃপ্রাচীরে বিদ্যমান এপিথেলিয়াল কোষগুলো ৩–৬ দিন বাঁচে। এগুলো সবসময় নতুন কোষ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে পাকস্থলির সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে।

এভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় পাকস্থলির প্রোটিন নির্মিত অন্তঃপ্রাচীর কখনোই নিজের ক্ষরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তবে *Helicobacter pylori* নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে কিংবা NSAID (Non Steroidal Anti Inflammatory Drug; ব্যাথানাশক ওষুধ) ধরনের ওষুধের প্রভাবে পাকস্থলিতে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে যা **গ্যাস্ট্রিক আলসার** (gastric ulcer) নামে বহুল পরিচিত।

## ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য পরিপাক (Digestion of Food in Small Intestine)

**পাকস্থলির পাইলোরিক স্ফিংক্টারের পর থেকে বৃহদন্ত্রের সূচনায় ইলিওকোলিক স্ফিংক্টার** (ileocolic sphincter) **পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৬-৭ মিটার লম্বা, প্যাচানো অংশকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে।** ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা **ডিওডেনাম** (duodenum), **জেজুনাম** (jejunum) ও **ইলিয়াম** (ileum)। ডিওডেনাম হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ যা দেখতে "U"-আকৃতির ও ২৫-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা। জেজুনাম মধ্যাংশ, লম্বায় প্রায় আড়াই মিটার। শেষ অংশটি ইলিয়াম যা ক্ষুদ্রান্ত্রের তিন-পঞ্চমাংশ গঠন করে।

[MAT: 16-17]

সব ধরনের খাদ্যের চূড়ান্ত পরিপাক ঘটে ক্ষুদ্রান্ত্রে। খাদ্যের উপর তিন ধরনের রস, যেমন-**পিত্তরস** (bile), **অগ্ন্যাশয় রস** (pancreatic juice) ও **আন্ত্রিক রস** (intestinal juice) ক্রিয়াশীল হয়।

### যান্ত্রিক পরিপাক

- আন্ত্রিক রসের মিউসিনের ক্রিয়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থিত খাদ্যবস্তু পিচ্ছিল হয়ে স্থানান্তরিত হয়।
- **ব্রুনার্স গ্রন্থি** (Brunner's gland) ও **গবলেট কোষ** (goblet cell) থেকে মিউকাস উৎপন্ন হয়। মিউকাস ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরকে এনজাইমের কার্যকারিতা থেকে রক্ষা করে।
- পিত্তরস পরোক্ষভাবে অন্ত্রে জীবাণুর কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
- পিত্তলবণগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশির ক্রমসঙ্কোচন বাড়িয়ে বৃহদন্ত্রের দিকে খাদ্যের গতি বৃদ্ধি করে।
- **কোলেসিস্টোকাইনিন** (cholecystokinin) নামক হরমোন পিত্তথলির সঙ্কোচন ঘটিয়ে পিত্তথলিতে সঞ্চিত পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে দেয়। [MAT 24-25]
- পিত্তলবণ স্নেহদ্রব্যকে **অবদ্রবণ** বা **ইমালসিফিকেশন** (emulsification)-এর মাধ্যমে সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে।

### রাসায়নিক পরিপাক

পাকস্থলি থেকে আগত অম্লীয় **কাইম** (chyme) অর্ধ-পাচিত আমিষ এবং প্রায় অপরিপাককৃত স্নেহদ্রব্য নিয়ে গঠিত। কাইম ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বরে পৌঁছালে অন্ত্রের প্রাচীর থেকে এন্টেরোকাইনিন (enterokinin), সিক্রেটিন (secretin) ও কোলেসিস্টোকাইনিন (cholecystokinin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এসব হরমোনের প্রভাবে পিত্তথলি, অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে যথাক্রমে পিত্তরস, অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রস নিঃসৃত হয়।

**পিত্তরস** অতিমাত্রায় ক্ষার জাতীয় তরল পদার্থ। **এতে কোন এনজাইম থাকে না**। পিত্তরসের সোডিয়াম বাইকার্বনেট উপাদানটি পাকস্থলি থেকে আগত অম্লীয় কাইমকে প্রশমিত করে অন্ত্রের অভ্যন্তরে এক ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্রান্ত্রে বিভিন্ন এনজাইমের কার্যকারিতার জন্য ক্ষারীয় মাধ্যমে অত্যন্ত প্রয়োজন।

### শর্করা পরিপাক

অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত রসে শর্করা পরিপাকের জন্য নিচে বর্ণিত এনজাইমগুলো ক্রিয়াশীল হয়।

১. অ্যামাইলেজ এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় জটিল শর্করাকে মল্টোজে পরিণত করে।

স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ।

২. **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজ জাতীয় শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ।

আন্ত্রিক রসে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাককারী নিম্নোক্ত এনজাইমগুলো ক্রিয়াশীল থাকে।

১. **আন্ত্রিক অ্যামাইলেজ** স্টার্চ, ডেক্সট্রিন প্রভৃতি পলিস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ ও ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন উৎপন্ন করে।

স্টার্চ, ডেক্সট্রিন + $H_2O$ $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ, ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন।

২. **আইসোমল্টেজ** এনজাইম আইসোমল্টোজ জাতীয় শর্করার আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটিয়ে মল্টোজ ও গ্লুকোজ উৎপন্ন করে।

আইসোমল্টোজ + $H_2O$ $\xrightarrow{\text{আইসোমল্টেজ}}$ মল্টোজ + গ্লুকোজ।

৩. **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজকে বিশ্লিষ্ট করে গ্লুকোজ তৈরি করে।

মল্টোজ + $H_2O$ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ।

৪. **সুক্রেজ** এনজাইম সুক্রোজ নামক ডাইস্যাকারাইডকে ভেঙে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ সৃষ্টি করে।

সুক্রোজ + $H_2O$ $\xrightarrow{\text{সুক্রেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ।

৫. **ল্যাক্টেজ** এনজাইম দুধের ল্যাক্টোজ নামক ডাই-স্যাকারাইডকে ভেঙে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু গ্যালাক্টোজে পরিণত করে।

ল্যাক্টোজ + $H_2O$ $\xrightarrow{\text{ল্যাক্টেজ}}$ গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ।

## আমিষ পরিপাক

অগ্ন্যাশয় রসে অবস্থিত এনজাইম আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপর নিম্নোক্তভাবে ক্রিয়াশীল হয়।

[DAT 24-25]

১. **ট্রিপসিন এনজাইম** নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। ডিওডেনামের মিউকোসা নিঃসৃত **এন্টেরোকাইনেজ** এনজাইমের সহায়তায় এটি সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত হয়। ট্রিপসিনের ক্রিয়ায় প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিণত হয়। [DAT 17-18,16-17]

প্রোটিওজ ও পেপটোন $\xrightarrow{\text{ট্রিপসিন}}$ পলিপেপটাইড।

২. **কাইমোট্রিপসিন** নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। পরে ট্রিপসিনের ক্রিয়ায় এটি সক্রিয় কাইমোট্রিপসিনে পরিণত হয়। এটি প্রোটিওজ ও পেপটোনকে ভেঙে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

প্রোটিওজ ও পেপটোন $\xrightarrow{\text{কাইমোট্রিপসিন}}$ পলিপেপটাইড।

৩. **কার্বোক্সিপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে সরল পেপটাইড (ডাইপেপটাইড) ও অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{কার্বোক্সিপেপটাইডেজ}}$ ডাইপেপটাইড + অ্যামিনো এসিড।

৪. **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৫. **ট্রাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিবর্তিত করে।

ট্রাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ট্রাইপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৬. **ডাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ডাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।

ডাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ডাইপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৭. **কোলাজিনেজ** এনজাইম মাছ ও মাংসে বিদ্যমান কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে রূপান্তরিত করে।

কোলাজেন $\xrightarrow{\text{কোলাজিনেজ}}$ সরল পেপটাইড।

৮. ইলাস্টেজ এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙে পেপটাইড উৎপন্ন করে। [DAT 22-23]

ইলাস্টিন $\xrightarrow{\text{ইলাস্টেজ}}$ পেপটাইড।

আন্ত্রিক রসে আমিষ পরিপাককারী এনজাইম **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

*** [MAT 15-16]

| পেপসিন ও ট্রিপসিনের মধ্যে পার্থক্য | |
|---|---|
| **পেপসিন (Pepsin)** | **ট্রিপসিন (Trypsin)** |
| ১. পাকস্থলিয় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির পেপটিক কোষ থেকে পেপসিন উৎপন্ন হয়। | ১. অগ্ন্যাশয় থেকে ট্রিপসিন উৎপন্ন হয়। |
| ২. পেপসিন পাকস্থলিতে নিঃসৃত হয়। | ২. ট্রিপসিন ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামে নিঃসৃত হয়। |
| ৩. এটি প্রথমে নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন হিসেবে নিঃসৃত হয় এবং পরে পাকস্থলিয় HCl এর সংস্পর্শে সক্রিয় পেপসিন-এ পরিণত হয়। | ৩. এটি প্রথমে নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন হিসেবে নিঃসৃত হয় এবং পরে ডিওডেনামের এন্টারোকাইনেজ এনজাইমের সংস্পর্শে সক্রিয় ট্রিপসিন-এ পরিণত হয়। |
| ৪. এটি পাকস্থলিতে প্রোটিনকে প্রোটিওজ ও পেপটোন-এ পরিণত করে। | ৪. এটি ডিওডেনামে প্রোটিওজ ও পেপটোনকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে। |

## স্নেহ পরিপাক

স্নেহ পরিপাকে **পিত্তরস** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিত্তরসে কোন এনজাইম থাকে না। পিত্তরসে অবস্থিত পিত্তলবণ, যেমন– **সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট** (sodium glycocholate), **সোডিয়াম টরোকোলেট** (sodium taurocholate), **পটাসিয়াম গ্লাইকোলেট** (potasium glycolate) ও **পটাসিয়াম টরোকোলেট** (potasium taurocholate) স্নেহজাতীয় খাদ্যকে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। এ প্রক্রিয়াকে **অবদ্রবণ** বা **ইমালসিফিকেশন** (emulsification) বলে।

অগ্ন্যাশয় রসে স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম স্নেহকণা পরিপাকে নিম্নোক্তভাবে ক্রিয়াশীল হয়।

১. লাইপেজ নামের এনজাইম স্নেহকণাকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে রূপান্তরিত করে।

স্নেহকণা $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল।

২. ফসফোলাইপেজ এনজাইম ফসফোলিপিডকে ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল ও ফসফোরিক এসিডে পরিণত করে।

ফসফোলিপিড $\xrightarrow{\text{ফসফোলাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল + ফসফোরিক এসিড।

৩. কোলেস্টেরল এস্টারেজ এনজাইম কোলেস্টেরল এস্টারের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে ফ্যাটি এসিড ও কোলেস্টেরল উৎপন্ন করে।

কোলেস্টেরল এস্টার $\xrightarrow{\text{কোলেস্টেরল এস্টারেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + কোলেস্টেরল।

আন্ত্রিক রসে নিম্নলিখিত স্নেহ পরিপাককারী এনজাইম ক্রিয়াশীল হয়।

১. লাইপেজ এনজাইম পিত্তলবণের প্রভাবে স্নেহকণায় পরিণত হওয়া লিপিডকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড উৎপন্ন করে। পরে তা ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে রূপান্তরিত হয়।

স্নেহকণা $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ মনোগ্লিসারাইড + ফ্যাটি এসিড।

২. লেসিথিনেজ এনজাইম লেসিথিনকে ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল, ফসফোরিক এসিড ও কোলিনে পরিণত করে।

লেসিথিন $\xrightarrow{\text{লেসিথিনেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল + ফসফোরিক এসিড + কোলিন। [DAT 23-24]

৩. মনোগ্লিসারাইডেজ কোষের ভিতরে মনোগ্লিসারাইডকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিবর্তিত করে।

মনোগ্লিসারাইড $\xrightarrow{\text{মনোগ্লিসারাইডেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল।

এছাড়াও আন্ত্রিক গ্রন্থির নিউক্লিয়েডেজ, নিউক্লিওটাইডেজ ও নিউক্লিওসাইডেজ এনজাইমসমূহ নিউক্লিক এসিড ও এর উপাদানগুলোকে ফসফেট গ্রুপ, পেন্টোজ শ্যুগার ও নাইট্রোজেন বেস-এ বিশ্লিষ্ট করে।

## পরিপাক গ্রন্থির ভূমিকা (Role of Digestive Glands)

**পৌষ্টিকতন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন রস ক্ষরিত হয়ে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে সেগুলোকে পৌষ্টিকগ্রন্থি বা পরিপাক গ্রন্থি বলে।** মানবদেহে পাঁচ ধরনের পৌষ্টিকগ্রন্থি রয়েছে, যথা- **লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি** ও **আন্ত্রিক গ্রন্থি**। এসব গ্রন্থির মধ্যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলির প্রাচীরে এবং আন্ত্রিক গ্রন্থি অন্ত্রের প্রাচীরে অবস্থান করে। অন্য গ্রন্থিগুলো পৌষ্টিকনালির বাইরে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্র গঠনবিশিষ্ট। নিচে বিভিন্ন পৌষ্টিকগ্রন্থির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

### ১. লালা গ্রন্থি (Salivary Glands)

মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে তিনজোড়া **লালা গ্রন্থি** বিদ্যমান। লালা গ্রন্থিগুলো এপিথেলিয়াম আবৃত গোল বা ডিম্বাকার রসনিঃসারী অসংখ্য থলি নিয়ে গঠিত। থলির প্রাচীরে **সেরাস কোষ** (serous cells) ও **মিউকাস কোষ** (mucous cells) থাকে। প্রত্যেক থলি থেকে একটি নালি বেরিয়ে লালা গ্রন্থির মূল নালিতে যুক্ত হয়। মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে নিচে বর্ণিত **তিনজোড়া** লালা গ্রন্থি অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে –

**ক. প্যারোটিড গ্রন্থি (Parotid Gland) :** এগুলো সবচেয়ে বড় লালা গ্রন্থি। প্রত্যেক কানের নিচে রয়েছে একটি করে মোট দুটি প্যারোটিড গ্রন্থি। প্রত্যেক গ্রন্থি থেকে একটি নালি বেরিয়ে দ্বিতীয় ঊর্ধ্বমোলার দাঁতের বিপরীতে মুখবিবরে উন্মুক্ত হয়। [DAT 20-21]

**খ. সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি (Submandibular Gland) :** প্রতি ম্যান্ডিবল বা নিম্ন চোয়ালের কৌণিক অঞ্চলের নিচে একটি করে মোট একজোড়া সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি অবস্থিত। এ গ্রন্থির নালি জিহ্বার নিচে **ফ্রেনুলাম** (frenulum) নামক বিশেষ ত্বকের পাশে উন্মুক্ত হয়।

**গ. সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (Sublingual Gland) :** জিহ্বার নিচে অবস্থান করে একজোড়া সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি। গ্রন্থির নালি জিহ্বার নিচে **ফ্রেনুলাম** (frenulum)- এ উন্মুক্ত হয়।

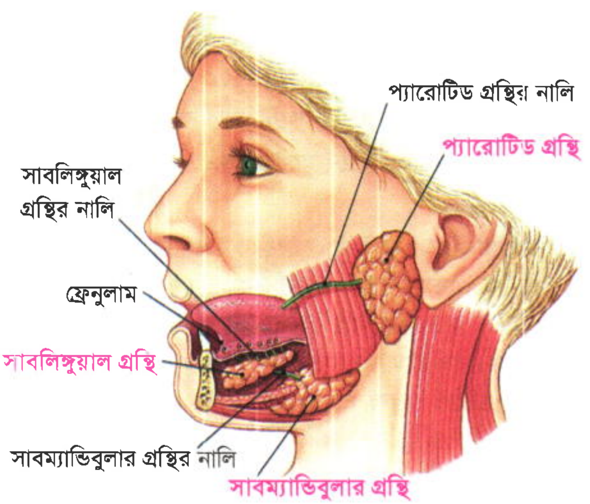

চিত্র ৩.৭ : মানুষের লালা গ্রন্থিসমূহ

#### লালা (Saliva)

লালা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে **লালা** বা **লালা রস** বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক ১২০০ - ১৫০০ মিলিলিটার লালা ক্ষরণ করে। লালা সামান্য অম্লীয়, ফলে মুখগহ্বরে সবসময় pH 6.2-7.4 মাত্রায় আম্লিক অবস্থা বিরাজ করে।

#### লালার উপাদান (Composition of Saliva)

১. পানি: ৯৫.৫% – ৯৯.৫%।
২. কোষীয় উপাদান : ঈস্ট, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, লিউকোসাইট, এপিথেলিয়াল কোষ ইত্যাদি।
৩. গ্যাস : প্রতি ১০০ মিলি লালায় ১ মিলি অক্সিজেন, ২৫ মিলি নাইট্রোজেন এবং ৫০ মিলি কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

৪. অজৈব পদার্থ : প্রায় ০.২%; সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট ইত্যাদি।

৫. জৈব পদার্থ: প্রায় ০.৩%; এনজাইম (টায়ালিন, লাইপেজ, কার্বনিক এনহাইড্রেজ, ফসফেটেজ, ব্যাকটেরিও-লাইটিক এনজাইম ইত্যাদি), মিউসিন, ইউরিয়া, অ্যামিনো এসিড, কোলেস্টেরল, ভিটামিন, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি।

### লালার কাজ (Functions of Saliva)

১. লালার অধিকাংশই পানি। খাদ্যের স্বাদ অনুভব ও পরিপাকের সময় বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য পানি খাদ্যের দ্রাবক হিসেবে খাদ্যকে ভিজিয়ে নরম করে। পানি মুখ অভ্যন্তরকেও সিক্ত করে, ফলে স্বাদ অনুভবসহ খাদ্য চিবানো ও গিলতে সুবিধা হয়। জিহ্বার স্বাদকুঁড়িগুলো শুকনো খাদ্যে প্রভাবিত হয় না। লালায় ভিজে খাদ্যকণা মুক্ত হলে তা থেকে স্বাদকুঁড়িগুলো অনুভূতি গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্যের স্বাদ উপলব্ধি সম্ভব হয়।

২. মুখ, জিহ্বা ও ঠোঁট লালায় সিক্ত থাকায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ হয়। ভয়, উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি সময়ে কিংবা অসুখের সময় লালাক্ষরণ কমে যায়, তখন কথা বলতে অসুবিধা হয়। এ অবস্থাকে **জেরোস্টোমিয়া** (xerostomia) বলে।

৩. **মিউসিন** নামক গ্লাইকোপ্রোটিন খাদ্যের সঙ্গে মিশে পিচ্ছিল খাবারকে দলায় পরিণত করে। লালা খাদ্য চর্বণ ও গলাধঃকরণে সহায়ক। অম্ল ও ক্ষারকে প্রশমন (বাফার) করতেও এটি সাহায্য করে।

৪. **ক্লোরাইড** (Chloride) স্যালিভারি অ্যামাইলেজকে সক্রিয় করে।

৫. **স্যালিভারি অ্যামাইলেজ বা টায়ালিন এনজাইম** (Salivary amylase or Ptyaline) রান্না করা স্টার্চের পলিস্যাকারাইডকে ভেঙ্গে মলটোজ এবং ডেক্সট্রিন নামক ডাইস্যাকারাইডে পরিণত করে।

৬. **বাইকার্বনেট** (Bicarbonate) লালার অম্লতা $p^H$ 6.2 – 7.4 এর মধ্যে বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটি বাফার (buffer) হিসেবে কাজ করে। ফলে মুখে সৃষ্ট এসিডের শক্তি কমিয়ে রাখার মাধ্যমে দাঁতের এনামেল ক্ষয় রোধ করে।

৭. **লাইসোজাইম এনজাইম** (Lysozyme enzyme) গৃহীত খাদ্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করে।

৮. লালা হচ্ছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমের অংশ।

৯. লালা সামগ্রিকভাবে মুখের ভিতর এবং দাঁত থেকে কোষীয় ও খাদ্যের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করে।

## ২. যকৃত (Liver)

**অবস্থান :** যকৃত উদর-গহ্বরের উপরভাগে ডানদিকে বেশিরভাগ অংশ জুড়ে **মধ্যচ্ছদা** বা ডায়াফ্রামের ঠিক নিচে ডিওডেনাম ও ডান বৃক্কের উপরদিকে পাকস্থলির ডান পাশে অবস্থিত এবং দেখতে লালচে-বাদামি রঙের। এটি একটি বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে।

**গঠন :** যকৃত মানবদেহের **সবচেয়ে বড়** ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষে এর ওজন প্রায় ১.৪–১.৮ কেজি; নারিদেহে ১.২–১.৪ কেজি; সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুদেহে ১৫০ গ্রাম। ডান, বাম, কোয়াড্রেট ও কডেট নামে ৪টি অসম্পূর্ণ খণ্ড নিয়ে যকৃত গঠিত। খণ্ডগুলো স্থিতিস্থাপক তন্তুসমৃদ্ধ ক্যাপসুলে আবৃত। ডান খণ্ডটি সবচেয়ে বড়। যকৃতের ডান খণ্ডের নিচের পিঠে **পিত্তথলি** (gall bladder) সংলগ্ন থাকে। যকৃত থেকে আসা ডান ও বাম **যকৃত নালি** মিলে একটি **অভিন্ন যকৃত নালি** গঠন করে। এটি পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে **অভিন্ন পিত্তনালি** গঠন করে যা **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampulla of vater) নামে নালির মাধ্যমে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়।

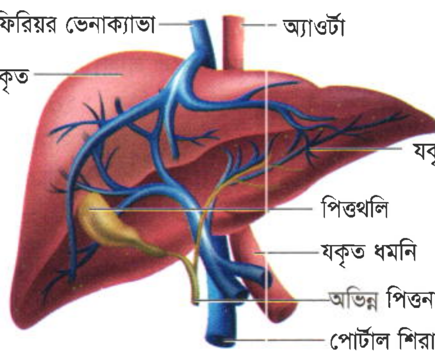


চিত্র ৩.৮ : মানুষের যকৃত

**যকৃতের আণুবীক্ষণিক গঠন :** আণুবীক্ষণিক গঠনে দেখা যায় [DAT 18-19] যকৃত **গ্লিসন ক্যাপসুল** (Glisson's capsule) নামক পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে যেটি যকৃতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে **যকৃত লোবিউল** (hepatic lobule) নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে। লোবিউলগুলো ৫ বা ৬ বাহুবিশিষ্ট, বহুভূজাকার। অধিকাংশ লোবিউল ১ মিলিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট। প্রতিটি লোবিউলের অন্তর্ভাগে অসংখ্য বহুভূজাকার **হেপাটিক কোষ** বা **হেপাটোসাইট** (hepatocyte) থাকে। লোবিউলের কেন্দ্রে একটি করে **কেন্দ্রীয় শিরা** (central vein) থাকে। লোবিউলের মাঝে রক্ত চলাচলের জন্য **সাইনুসয়েড** (sinusoid) নামক ফাঁকা স্থান থাকে। [DAT 21-22, 17-18, 16-17] সাইনুসয়েডগুলো **কাপফার কোষ** (kupffer's cell) দিয়ে আবৃত। এসব কোষ লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, অণুজীব এবং বহিরাগত কণাকে গলাঃকরণ করে। দুই বা ততোধিক লোবিউলের সংযোগস্থলে যোজক টিস্যু পরিবৃত্ত ধমনি, শিরা ও পিত্তনালির শাখা থাকে।

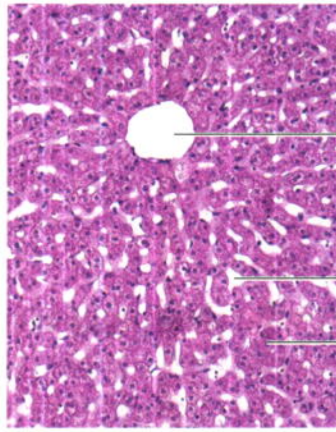


চিত্র ৩.৯ : যকৃত লোবিউলের অনুচ্ছেদ

## যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা (Storage & Metabolic Role of Liver)

মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হচ্ছে যকৃত যা দেহের ওজনের প্রায় ৩–৫%। এটি মূলত পরিবর্তনশীল বাহ্যিক অবস্থা সত্ত্বেও দেহের অভ্যন্তরীণ স্থিতি বা সাম্য রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যকৃতে নানা ধরনের জৈব-রাসায়নিক (bio-chemical) বিক্রিয়া সংঘটিত হয়ে দেহের **বিপাক** (metabolism) ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে একে মানবদেহের **জৈব রসায়নাগার** (organic laboratory) বলা হয়। এখানে প্রায় পাঁচ শতাধিক জৈবনিক কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। নিচে যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

### যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা (Storage functions of Liver)

**যকৃত** দেহের প্রধান **সঞ্চয় কেন্দ্র**। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে পরিশোষিত সরল খাদ্যোপাদানসমূহ পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকৃতে প্রবেশ করে। এখানে বিভিন্ন খাদ্যোপাদান স্বরূপে বা পরিবর্তিতরূপে সঞ্চিত হয়। নিচে যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

[DAT 22-23 MAT 14-15]

১. **গ্লাইকোজেন সঞ্চয় (Storage of Glycogen) :** ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে গ্লুকোজ যকৃতে প্রবেশ করে। রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ **গ্লাইকোজেনেসিস** (glycogenesis) প্রক্রিয়ায় **গ্লাইকোজেন**-এ রূপান্তরিত হয়ে যকৃতের সঞ্চয়ী কোষে জমা থাকে। **ইনসুলিন** (insulin) নামক হরমোন এ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। প্রয়োজনে এ গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা সঠিক রাখে।

২. **রক্ত সঞ্চয় (Blood Reservoir) :** প্লীহা ও অন্ত্র থেকে বেরিয়ে রক্তবাহিকাগুলো মিলিত হয়ে **হেপাটিক পোর্টাল শিরা** গঠন করে। যকৃতের ভিতর দিয়ে রক্ত যদিও অনবরত প্রবাহিত হয় তারপরও এর রক্তবাহিকাগুলোসহ এ শিরা বিপুল পরিমাণ রক্তের **ভান্ডার** (reservoir) হিসেবে কাজ করে। যকৃত প্রায় ১৫০০ ঘন সে.মি. পর্যন্ত রক্ত সঞ্চয় করে রাখতে পারে যা দেহের বিভিন্ন রক্তক্ষরণজনিত ঘটনায় মূল রক্তসংবহনের সাথে মিলিত হয়ে রক্তচাপের সমন্বয় ঘটায়।

৩. **ভিটামিন সঞ্চয় (Storage of Vitamins) :** যকৃত স্নেহে (fat) দ্রবণীয় ভিটামিন (A, D, E, K), পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (B ও C), সায়ানো কোবালামিন ($B_{12}$) এবং ফলিক এসিড ($B_9$) সঞ্চয় করে। $B_{12}$ এবং ফলিক এসিড অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকা তৈরিতে প্রয়োজন হয়। [MAT 15-16; DAT 22-23, 19-20]

৪. **পিত্তরস সঞ্চয় (Storage of Bile) :** যকৃত থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয়ে পিত্তথলিতে জমা থাকে যা খাদ্য পরিপাকে বিরতিহীনভাবে সরবরাহ হয়। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের যকৃত দৈনিক প্রায় ৪০০ থেকে ৮০০ মিলিলিটার পিত্তরস তৈরি করে।

৫. চর্বি ও অ্যামিনো এসিড সঞ্চয় (Storage of Fat & Amino acid) : যে শর্করা (গ্লুকোজ) দেহে ব্যবহৃত হতে পারে না বা গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে না, যকৃত সেই অতিরিক্ত গ্লুকোজকে চর্বিতে পরিণত করে জমা রাখে। যকৃত অ্যামিনো এসিডও জমা রাখে। দেহের প্রয়োজনে চর্বি এবং অ্যামিনো এসিড ব্যবহারযোগ্য গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়।

৬. খনিজ সঞ্চয় (Storage of Mineral) : যকৃত লৌহ ও পটাসিয়াম সঞ্চয় করে। লোহিত রক্ত কণিকার ভাঙনে হিমোগ্লোবিন যকৃতের **কাপফার** (Kupffer) কোষের মাধ্যমে ভেঙ্গে **হিম** (haem) ও **গ্লোবিন** (globin)-এ পরিণত হয়। হিমের লৌহ অংশ **ফেরিটিন** (ferritin) হিসেবে যকৃতে জমা থাকে। এছাড়াও কপার, জিঙ্ক, কোবাল্ট ইত্যাদি মিনারেল স্বল্পমাত্রায় যকৃতে জমা থাকে।

## যকৃতের বিপাকীয় ভূমিকা (Metabolic functions of Liver)

**যকৃত** দেহের অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা বজায় রাখার প্রধান অঙ্গ। এতে নানা ধরনের জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় যা দেহের বিপাক ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যকৃত শর্করা, আমিষ ও স্নেহবস্তু বিপাকের প্রধান স্থান। যকৃতে নিচে বর্ণিত বিপাকীয় কার্যাবলী সংঘটিত হয়।

১. শর্করা বিপাক (Carbohydrate Metabolism) : শর্করা বিপাকে যকৃতের ভূমিকাই মুখ্য। যকৃতে শর্করার বিপাককে নিচে বর্ণিত উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়।

- **গ্লাইকোজেনেসিস (Glycogenesis)** : অন্ত্র থেকে **হেপাটিক পোর্টাল শিরার** মাধ্যমে চিনি (যেমন–গ্লুকোজ) যকৃতে প্রবেশ করে। এ শিরাটি বিভিন্ন মাত্রায় চিনি বহনকারী একমাত্র রক্তবাহিকা। শর্করা বিপাকে যকৃতই দেহে গ্লুকোজ মাত্রা প্রতি ১০০ ঘন সেন্টিমিটারে ৯০ মিলিগ্রাম গ্লুকোজ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করে। যে ধরনের খাবারই গ্রহণ করা হোক না কেন রক্তে গ্লুকোজ মাত্রা যেন না বাড়ে বা কমে, যকৃত তা প্রতিরোধ করে। গ্যালাক্টোজ, ফ্রুক্টোজসহ সমস্ত হেক্সোজ শর্করাকে যকৃত গ্লুকোজে পরিবর্তিত করে **গ্লাইকোজেন** (glycogen) নামক অদ্রবণীয় পলিস্যাকারাইড হিসেবে জমা রাখে। গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন রূপান্তর প্রক্রিয়াটিকে **গ্লাইকোজেনেসিস** বলে। প্রক্রিয়াটি ইনসুলিনের উপস্থিতিতে উদ্দীপ্ত হয়। **ইনসুলিন** (insulin) হচ্ছে রক্তে চিনির মাত্রা (লেভেল) বেড়ে গেলে তার প্রতি সাড়া হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (Islets of Langerhans) থেকে উৎপন্ন হরমোন।
- **গ্লুকোনিয়োজেনেসিস (Gluconeogenesis)** : যে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অশর্করা জাতীয় উপাদান থেকে **গ্লুকোজ** শর্করা উৎপন্ন হয়, তাকে **গ্লুকোনিয়োজেনেসিস** বলে। এটি শর্করার উপচিতিমূলক বিপাক। যা প্রধানত যকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়। দেহের চাহিদার প্রেক্ষিতে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি কমে গেলে যকৃত অ্যামিনো এসিড, ল্যাকটিক এসিড, পাইরুভিক এসিড, গ্লিসারল ইত্যাদি অশর্করা জাতীয় উপাদান থেকে গ্লুকোজ তৈরি করে রক্তে প্রেরণ করে, ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ে। এ প্রক্রিয়াটি **গ্লুকাগন** হরমোন দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়। এভাবে যকৃত রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা ৯০ মিলিগ্রাম/১০০ ঘন সেন্টিমিটার বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- **গ্লাইকোজেনোলাইসিস (Glycogenolysis)** : রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়ায় যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং রক্তে মিশে যায়। এ প্রক্রিয়াটি **এপিনেফ্রিন** ও **গ্লুকাগন** হরমোন দিয়ে প্রভাবিত হয়।
- **লাইপোজেনেসিস (Lipogenesis)** : রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা যদি এমন পরিমাণ বেড়ে যায় যে তা শক্তি উৎপাদন ও গ্লাইকোজেন সঞ্চয় ক্ষমতার মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় তখন ইনসুলিন হরমোনের প্রভাবে যকৃত অতিরিক্ত গ্লুকোজকে ট্রাইগ্লিসারাইড (triglyceride = TG)-এ রূপান্তরিত করে। এ ট্রাইগ্লিসারাইড কোষে চর্বি হিসেবে জমা হয়। এজন্য অতিরিক্ত শর্করা জাতীয় খাদ্য খেলে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড (TG) মাত্রা বেড়ে যায় যা **হৃৎরোগ** ও **স্ট্রোকের** অন্যতম প্রধান ঝুঁকির উপাদান (risk factor)।

RMDAC



| গ্লাইকোজেনেসিস ও গ্লাইকোজেনোলাইসিসের মধ্যে পার্থক্য | | |
|---|---|---|
| পার্থক্যের বিষয় | গ্লাইকোজেনেসিস | গ্লাইকোজেনোলাইসিস |
| ১. প্রকৃতি | এ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়। | এ প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজে পরিণত হয়। |
| ২. প্রভাবক | ইনসুলিন। | গ্লুকাগন। |
| ৩. গুরুত্ব | রক্তে শর্করার পরিমাণ কমায় বা ভারসাম্য বজায় রাখে। | রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ায় (শর্করা কমে গেলে)। |

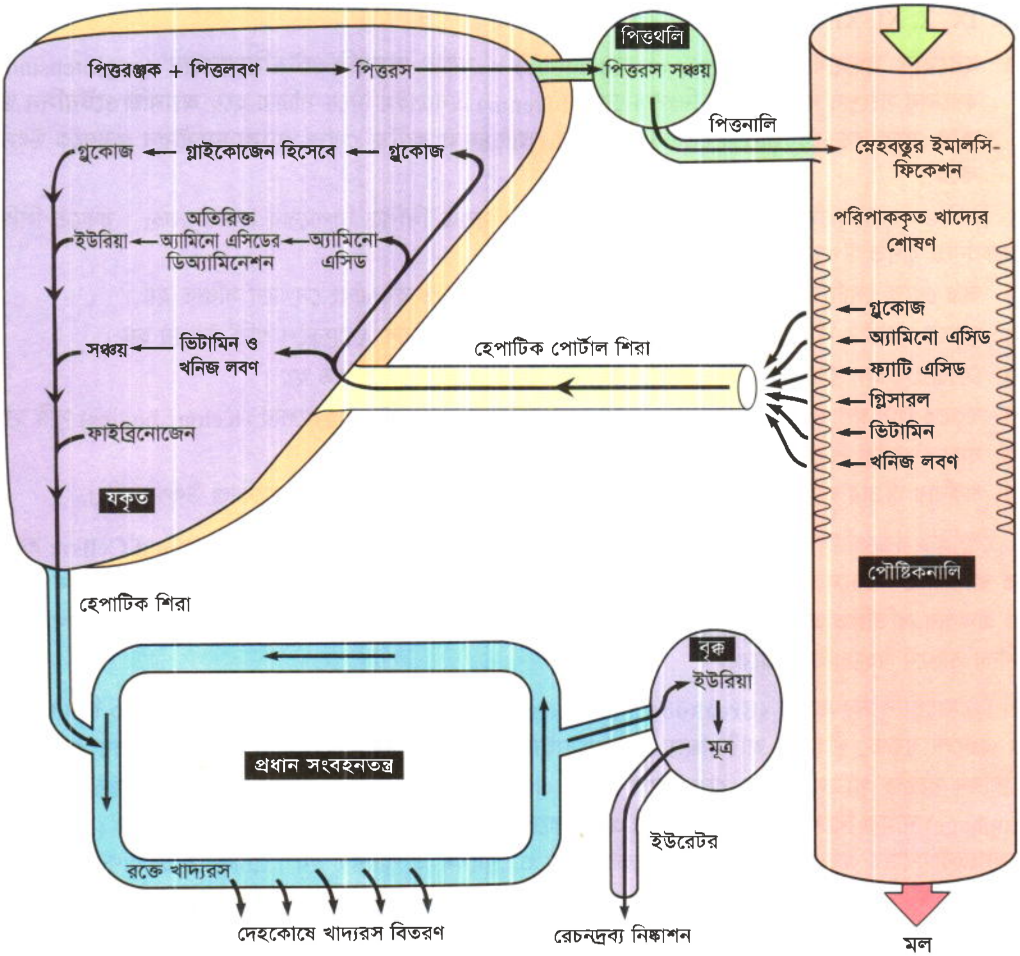


চিত্র ৩.১০ : যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকার চিত্ররূপ

২. প্রোটিন বিপাক (Protein Metabolism) : প্রোটিন বিপাকে যকৃত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব ভূমিকাকে নিচে বর্ণিত শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

- **ডিঅ্যামিনেশন (Deamination)** : কোন অ্যামিনো এসিড বা অন্য উপাদান থেকে অ্যামিনো গ্রুপের অপসারণ প্রক্রিয়াকে **ডিঅ্যামিনেশন** বলে। খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড দেহ জমিয়ে রাখতে পারে না। যকৃত অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড **ডিঅ্যামিনেশন** প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে কিটো এসিড ও অ্যামিন

[MAT 24-25]

মূলক (-$NH_2$) উৎপন্ন করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনের জন্য **ক্রেবস চক্রে** প্রবেশ করে। অ্যামিন মূলক (-$NH_2$) হাইড্রোজেন আয়ন ($H^+$) এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া ($NH_3$) উৎপন্ন করে।

- **ইউরিয়া তৈরি (Urea Formation)** : অ্যামোনিয়া অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ যা দেহে জমা হলে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। যকৃতে **অরনিথিন চক্রে** (Ornithine cycle) শর্করা বিপাকে সৃষ্ট $CO_2$ এর সাথে অ্যামোনিয়া যুক্ত হয়ে **ইউরিয়া** সৃষ্টি করে। ইউরিয়া রক্তবাহিত হয়ে বৃক্ক থেকে মূত্ররূপে দেহ নির্গত হয়।
- **প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ (Synthesis of Plasma Proteins)** : যকৃত $\gamma$ গ্লোবিউলিন ছাড়া প্রায় সব ধরনের [MAT 19-20] প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ করে। যকৃতে যেসব প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় সেগুলো হচ্ছেঃ অ্যালবুমিন, লিপোপ্রোটিন, ট্রান্সফেরিন, সেরোপ্লাজমিন, গ্লোবিউলিন, $\propto$ ফিটোপ্রোটিন ও রক্ত তঞ্চন ফ্যাক্টর I, II, V, VII, IX, X, XI, XII .
- **হরমোন সংশ্লেষ (Synthesis of Hormone)** : যকৃত **অ্যানজিওটেনসিনোজেন** (angiotensinogen) হরমোন সংশ্লেষ করে যা বৃক্ক নিঃসৃত **রেনিন** (renin) এনজাইম দিয়ে সক্রিয় হয়ে **অ্যানজিওটেনসিন** উৎপন্ন করে দেহে রক্তচাপ বাড়িয়ে তোলে। তাছাড়া, অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে **অ্যালডোস্টেরন** ক্ষরণকে উৎসাহিত করে।

**৩. লিপিড (ফ্যাট) বিপাক (Lipid Metabolism) :** যকৃত লিপিড বিপাকের প্রধান কেন্দ্র। যকৃতে লিপিডের বিপাককে নিচে বর্ণিত উপায়ে বর্ণনা করা যায় :

- অন্ত্র থেকে শোষিত স্নেহপদার্থ যকৃতে পৌঁছে চর্বিতে পরিণত হয় এবং সেখানে সঞ্চিত হয়।
- যকৃতে ফ্যাটের অক্সিজেন সংযোগে দহন বা অক্সিডেশনের ফলে ATPরূপে শক্তি উৎপন্ন হয়।
- কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড, লাইপোপ্রোটিন প্রভৃতি যকৃতে সংশ্লেষিত হয়।
- যকৃতে গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডের জারণ ঘটে, ফলে কিটোনবর্গীয় বস্তুগুলোর (Ketone bodies) সৃষ্টি হয়।
- যকৃতে শর্করা ও প্রোটিন থেকে ফ্যাট সংশ্লেষিত হয়।
- শর্করার অভাব হলে (দীর্ঘ সময় খাদ্য গ্রহণ না করলে) সঞ্চিত ফ্যাট থেকে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।

**৪. লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন ও ভাঙন (Production and Destruction of Red Blood Cells) :** ভ্রূণদেহে লোহিত কণিকা উৎপাদনে যকৃত নিয়োজিত থাকে। পরবর্তী সময়ে অস্থিমজ্জার কোষগুলো এ দায়িত্ব পালন করে। এ প্রক্রিয়া একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যকৃত তখন বিপরীত ভূমিকা পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ যকৃত তখন লোহিত রক্তকণিকা ভাঙনে সহযোগিতা করে।

**৫. হিমোগ্লোবিনের ভাঙন (Breakdown of Haemoglobin) :** লোহিত রক্তকণিকার আয়ু ১২০ দিন (৪ মাস)। এরপর এগুলো যকৃত, প্লীহা ও অস্থিমজ্জায় **ফ্যাগোসাইটিক ম্যাক্রোফেজ** কোষের ক্রিয়ায় ভেঙে যায় এবং কণিকার হিমোগ্লোবিন রক্তের প্লাজমায় মুক্ত হয়ে মিশে যায়। এগুলোকে তখন যকৃত, প্লীহা ও লসিকা গ্রন্থির **ম্যাক্রোফেজ** (macrophage) নামক বিশেষ শ্বেত রক্তকণিকা গ্রহণ করে। যকৃতের ম্যাক্রোফেজকে **কাপফার কোষ** (Kupffer cell) বলে। ম্যাক্রোফেজের অভ্যন্তরে হিমোগ্লোবিন ভেঙ্গে **হিম** ও **গ্লোবিন**-এ পরিণত হয়। গ্লোবিন হচ্ছে অণুর প্রোটিন অংশ, এটি তার নিজস্ব অ্যামিনো এসিডে বিশ্লিষ্ট হয়। হিম থেকে আয়রন অংশ সরে গেলে অণুর বাকি অংশ **বিলিভারডিন** (biliverdin) নামে সবুজ রঞ্জক উৎপন্ন করে। এ রঞ্জক হলদে **বিলিরুবিন** (bilirubin)-এ পরিবর্তিত হয়। আয়রন ফেরিটিন (ferritin) রূপে দেহে সঞ্চিত থাকে। এটি হিমোগ্লোবিন উৎপন্নে অস্থিমজ্জার কোষে পুনর্ব্যবহৃত হয়।

**৬. পিত্ত উৎপাদন (Bile Production) :** যকৃত কোষ (হেপাটোসাইট) অবিরাম **পিত্ত** ক্ষরণ করে এবং পিত্তথলিতে জমা রাখে। যকৃত কোষ স্টেরয়েড থেকে পিত্ত লবণ, যেমন–সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট (sodium glycocholate) ও সোডিয়াম টরোকোলেট (sodium taurocholate) সংশ্লেষ করে। পরিপাক অঙ্গ হিসেবে যকৃতের পিত্ত উৎপাদন ও ক্ষরণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

**৭. হরমোন সংশ্লেষ (Synthesis of Hormone) :** যকৃত **অ্যানজিওটেনসিনোজেন** (angiotensinogen) নামক হরমোন সংশ্লেষ করে যা বৃক্ক নিঃসৃত **রেনিন** (renin) এনজাইম দিয়ে সক্রিয় হয়ে দেহে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

**৮. হরমোনের ভাঙন (Breakdown of Hormones) :** যকৃত প্রায় সব হরমোনই কম-বেশি ধ্বংস করে। তবে টেস্টোস্টেরন ও অ্যালডোস্টেরন যত দ্রুত ধ্বংস হয় অন্য হরমোনগুলো (ইনসুলিন, গ্লুকাগন, আন্ত্রিক হরমোন, স্ত্রী যৌন হরমোন, অ্যাড্রেনাল হরমোন, থাইরক্সিন প্রভৃতি) তত দ্রুত ধ্বংস হয় না। এভাবে যকৃত বিভিন্ন হরমোনের কর্মকান্ডে স্থায়ী অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (হোমিওস্ট্যাসিস) সৃষ্টি করে।

**৯. টক্সিন বা বিষ অপসারণ (Detoxification) :** শরীরের ভিতর স্বাভাবিক কর্মকান্ডের ফলে উৎপন্ন যেসব পদার্থ মাত্রাতিরিক্ত জমা হলে দেহে বিষময়তার সৃষ্টি করে এমন পদার্থকে **টক্সিন** (toxin) বা **বিষ** বলে। যকৃত কোষের অভ্যন্তরে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এ বিষ প্রশমিত হয়ে যায়। অনেক ওষুধও দেহ থেকে অপসারণ করে।

**১০. তাপ উৎপাদন (Production of Heat) :** যকৃতের অভ্যন্তরে নানা ধরনের বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ায় এখানে প্রচুর তাপ উৎপাদিত হয়। এ তাপ রক্তবাহিকার মাধ্যমে সমগ্র দেহে সঞ্চালিত হয়, ফলে দেহে তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকে (homeotherm) অর্থাৎ বাইরের তাপমাত্রার পরিবর্তনে দেহের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে না।

**১১. রক্ত ব্যাকটেরিয়ামুক্ত রাখা (Blood Cleansing Function) :** পোর্টাল শিরা যখন যকৃতে প্রবেশ করে তখন যকৃতের **কাপফার কোষগুলো** (Kupffer cells) পোর্টাল শিরা মধ্যস্থ রক্তের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। ফলে সিস্টেমিক সংবহনে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করতে পারে না।

## যকৃতের নিঃসরণ– পিত্তরস (Secretion of Liver — Bile)

[DAT 17-18]

**পিত্তরস (Bile) বা পিত্ত :** যকৃত কোষ থেকে নিঃসৃত **পিত্তরস** হলদে-সবুজ, আঠালো, তিক্ত স্বাদধারী ক্ষারীয় তরল (pH 7.5 - 8.5) পদার্থ। পিত্তরস যকৃত থেকে নিঃসৃত হয়ে বাম ও ডান যকৃতনালি পথে **অভিন্ন যকৃতনালি**তে আসে এবং **সিস্টিকনালি** দিয়ে পিত্তথলিতে জমা হয়। অভিন্ন যকৃতনালি ও সিস্টিকনালি মিলিত হয়ে **অভিন্ন পিত্তনালি** (common bile duct) তৈরি করে যা **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampulla of vater)-এর মাধ্যমে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের যকৃত দৈনিক প্রায় ৪০০ থেকে ৮০০ মিলিলিটার পিত্তরস তৈরি করে।

[DAT 20-21] **উপাদান :** পিত্তরস যেসব উপাদানে গঠিত তা হচ্ছে–

i. পানি (৯৭% – ৯৮%)।
ii. অজৈব লবণ (সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কার্বনেট ও ফসফেট–০.৮%)।
iii. পিত্তলবণ (সোডিয়াম টোরোকলেট ও সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট–০.৮%)।
iv. পিত্ত রঞ্জক (বিলিরুবিন ও বিলিভারডিন–০.২%)।
v. কোলেস্টেরল (০.৩৮%) এবং
vi. ফ্যাট (০.৮%)।

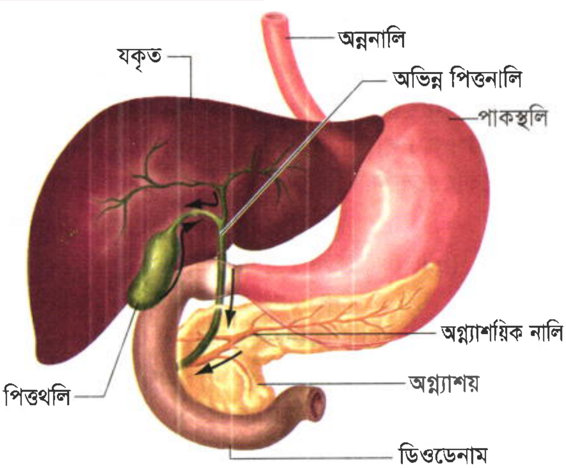

চিত্র ৩.১১ : পৌষ্টিকতন্ত্রে প্রধান কয়েকটি অঙ্গের অবস্থান

### পিত্তরসের কাজ

১. পিত্তরস চর্বিজাতীয় খাদ্যকে **ইমালসিফিকেশন** (emulsification) প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে।
২. পিত্তলবণ চর্বি পরিপাককারী এনজাইম লাইপেজকে সক্রিয় করে পরিপাকে সাহায্য করে।
৩. পিত্তরস **মাইসেলি** (micelles) তৈরির মাধ্যমে চর্বিজাতীয় খাদ্যসার শোষণে সহায়তা করে।
৪. পিত্তলবণ চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন A, D, E, K-কে শোষণে সহায়তা করে।
৫. পিত্তরসের মাধ্যমে কপার, জিংক, পারদ, টক্সিনজাতীয় পদার্থ, কোলেস্টেরল ইত্যাদি নিষ্কাশিত হয়।
৬. পিত্তরসে বেশি ক্ষারক পদার্থের উপস্থিতির জন্য HCl কে প্রশমিত করে pH নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাকস্থলি থেকে ডিওডেনামে আগত অম্লীয় কাইমকে প্রশমিত করে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।
৭. পিত্তরসের **মিউসিন** বাফার ও লুব্রিকেন্ট (পিচ্ছিলকারক পদার্থ) হিসেবে কাজ করে।
৮. পিত্তলবণ কোলনে **পেরিস্ট্যালসিস** (colon peristalsis) বাড়িয়ে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

[MAT 19-20,16-17,15-16; DAT 18-19]



## ৩. অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

অবস্থান : অগ্ন্যাশয় পাকস্থলির নিচে অবস্থিত এবং উদর গহ্বরের ডিওডেনামের অর্ধবৃত্তাকার কুন্ডলীর ফাঁক থেকে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বাটে আকৃতির (মরিচের মতো) গোলাপী-ধূসর বর্ণের মাংসল একটি গ্রন্থি।

গঠন : অগ্ন্যাশয় ১২–১৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও প্রায় ৫ সেন্টিমিটার চওড়া একটি **মিশ্র গ্রন্থি** (mixed gland)। এর চওড়া যে দিকটি ডিওডেনামের কুন্ডলির ফাঁকে থাকে তার নাম **মাথা**; যে অংশ সংকীর্ণ হয়ে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত সেটি **লেজ**; এবং মাথা ও লেজের মাঝের অংশকে **দেহ** বলে। অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থিগুলো থেকে ছোট ছোট নালিকা বেরিয়ে একত্রিত হয়ে **উইর্সাং নালি** (duct of Wirsung) গঠন করে। এ নালি গ্রন্থির দৈর্ঘ্য বরাবর এসে ডিওডেনামের কাছে অভিন্ন পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampulla of Vater) -এর মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

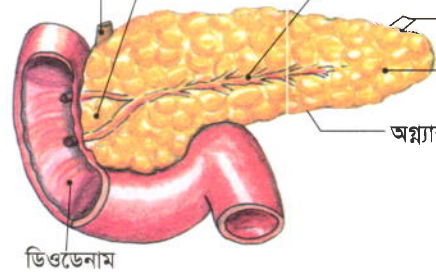

চিত্র ৩.১২ : মানুষের অগ্ন্যাশয়ের বিভিন্ন অংশ

অগ্ন্যাশয় বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা উভয় প্রকার গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। এজন্য এটি একটি মিশ্র গ্রন্থি।

বহিঃক্ষরা গ্রন্থি : অগ্ন্যাশয়ে অসংখ্য **লোবিউল** (lobule) থাকে। প্রতিটি লোবিউল অসংখ্য **অ্যাসিনি** (acini) নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক লোবিউল একটি কেন্দ্রীয় **লুমেন** (ক্ষুদ্র নালি) এবং লুমেনকে ঘিরে বৃত্তাকারে সজ্জিত একসারি কোষ নিয়ে গঠিত। লোবিউলের কোষ থেকে **অগ্ন্যাশয় রস** নিঃসৃত হয়। লুমেন প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র অগ্ন্যাশয় নালিকা। সকল অ্যাসিনাসের লুমেন বা ক্ষুদ্র অগ্ন্যাশয় নালিকাগুলো একত্রিত হয়ে প্রধান **অগ্ন্যাশয় নালি** বা **উইর্সাং নালি** গঠন করে।

লোবিউল বা অ্যাসিনাস নালিযুক্ত গ্রন্থি, তাই একে **সনাল গ্রন্থি** বলে এবং এদের ক্ষরণ বহির্মুখী অর্থাৎ নালির মাধ্যমে অগ্ন্যাশয় রস বাহিত হয় বলে এদের **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** (exocrine gland) বলা হয়।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি : লোবিউলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কিছু বহুভুজাকার কোষ গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। এদের **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (Islets of Langerhans) বা **ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপপুঞ্জ** বলে। এতে ৪ ধরনের কোষ পাওয়া যায়। কোষগুলো নালিবিহীন এবং এগুলো থেকে **হরমোন** ক্ষরিত হয়। কোষগুলো হচ্ছে :

[MAT 22-23] i. আলফা কোষ (α cell; ২০%) : এটি **গ্লুকাগন** (glucagon) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা (glucose level) বৃদ্ধি করে।

ii. বিটা কোষ (β cell; ৫০–৭০%) : এটি **ইনসুলিন** (insulin) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা (glucagon level) কমায়।

iii. ডেল্টা কোষ (δ cell; ১০%) : এটি **সোমাটোস্টাটিন** (somatostatin) হরমোন ক্ষরণ করে, যা আলফা ও বিটা কোষের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং

iv. পিপি কোষ (PP cell; ৩-৫%) বা গামা কোষ (γ cells) : এটি প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড ক্ষরণ করে।

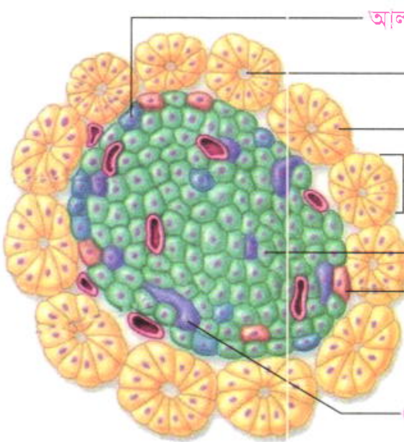

চিত্র ৩.১৩ : অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদের অংশবিশেষ

### অগ্ন্যাশয় রসের উপাদান

১. পানি : ৯৮%।

২. জৈব বস্তু : ১.৮%–ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাক্টেজ, কাইমোট্রিপসিন, নিউক্লিয়েজ ইত্যাদি এনজাইম।

৩. অজৈব বস্তু : ০.২%–সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও জিঙ্কের বাইকার্বনেট লবণ ইত্যাদি।

### পরিপাকে অগ্ন্যাশয়ের ভূমিকা

খাদ্য পাকস্থলি থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে যাওয়ার সময় ক্ষারীয় তরলরূপী ($p^H 8 - 8.3$) **অগ্ন্যাশয় রস** নিঃসৃত হয়। অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশ থেকে দুধরনের ক্ষরণ মিলে অগ্ন্যাশয় রস গঠন করে, যেমন– **পরিপাক এনজাইম** এবং **একটি ক্ষারীয় তরল**। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয় থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিপাককারী এনজাইম নিঃসৃত হয়। আমিষ, শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এসব এনজাইমসমূহের পরিপাকে অংশগ্রহণের ধরন নিম্নরূপ:

Reading

#### শর্করা পরিপাককারী এনজাইম ও তাদের কাজ

- **অ্যামাইলেজ** এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় জটিল শর্করাকে মল্টোজে পরিণত করে।
- **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজ জাতীয় শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

#### আমিষ পরিপাককারী এনজাইম ও তাদের কাজ

- **ট্রিপসিন** এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।
- **কাইমোট্রিপসিন** এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে পলিপেটাইডে পরিণত করে।
- **কার্বক্সিপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে সরল পেপটাইড ও অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।
- **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **ট্রাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **ডাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ডাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **কোলাজিনেজ** এনজাইম কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে রূপান্তরিত করে।
- **ইলাস্টেজ** এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙে পেপটাইড উৎপন্ন করে।

#### স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম ও তাদের কাজ

- **লাইপেজ** এনজাইম চর্বি (লিপিড)-কে ভেঙে ফ্যাটি এসিডে রূপান্তরিত করে।
- **কোলেস্টেরল এস্টারেজ** এনজাইম কোলেস্টেরল এস্টারকে ফ্যাটি এসিড ও কোলেস্টেরল-এ বিশ্লিষ্ট করে।

Reading

#### পরিপাক সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও অগ্নাশয় রস যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করে তা হলো–

১. অগ্ন্যাশয় রস অম্লক্ষারের সমতা রক্ষা করে।
২. অগ্ন্যাশয় রস ক্ষারীয় হওয়ায় ডিওডেনামে পাকস্থলি থেকে আগত তীব্র আম্লিক কাইম (পাকমণ্ড) ক্ষারীয় মাধ্যমে নিরপেক্ষ হয়, ফলে এনজাইমের কার্যকারিতায় খাদ্যবস্তুর পরিপাক সম্পূর্ণ হয়।
৩. অগ্ন্যাশয় রস দেহে পানির সাম্য রক্ষা করে।
৪. অগ্ন্যাশয় রস দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

## ৪. গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (Gastric Glands)

**পাকস্থলি** (stomach) একটি থলিসদৃশ অঙ্গ এবং এর প্রাচীর **পেশি** ও **মিউকোসা** (mucosa) দিয়ে গঠিত। মিউকোসা স্তরটি সরল স্তম্ভাকার এপিথেলিয়ামে (columnar epithelium) আবৃত যা প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন **গ্যাস্ট্রিক পিট** (gastric pit) সম্পন্ন। গ্যাস্ট্রিক পিট **গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি** ধারণ করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এক ধরনের নলাকার গ্রন্থি এবং বিভিন্ন ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক ধরনের কোষের ক্ষরণ পৃথক। সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির রসকে **গ্যাস্ট্রিক জুস** (gastric juice) বলে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ দিনে প্রায় ২ লিটার গ্যাস্ট্রিক জুস তৈরি করে। [DAT 16-17] গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কোষগুলোর নাম ও কাজ নিম্নরূপ–

[MAT 19-20]

১. অক্সিনটিক কোষ (Oxyntic cell) : এগুলো **প্যারাইটাল কোষ** (parietal cell)-নামে পরিচিত এবং **হাইড্রোক্লোরিক এসিড** ও ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর উৎপন্ন করে যা Vit $B_{12}$ শোষণে সাহায্য করে।

২. মিউকাস কোষ (Mucous cell) : এসব কোষ পিচ্ছিল ক্ষারীয় **মিউকাস** উৎপন্ন করে।

৩. আর্জেন্টাফিন কোষ (Argentaffin cell) : দানাদার এসব কোষ **সেরোটনিন** (serotonin) নিঃসৃত করে পাকস্থলির প্রাচীরে অবস্থিত বলয়াকার পেশিগুলোর ছন্দোময় সঙ্কোচন প্রবাহ বা **পেরিস্ট্যালসিস** নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. জাইমোজেনিক কোষ (Zymogenic cell) : জাইমোজেনিক কোষকে **চীফ কোষ** (chief cell)-ও বলে। এ কোষ থেকে পেপসিনোজেন ও গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ উৎপন্ন হয়। [MAT 15-16]

**৫. গ্যাস্ট্রিন কোষ (Gastrin cell) :** একে **জি-কোষ** (G-cells) বলে। এগুলোও **গ্যাস্ট্রিন** (gastrin) নামক হরমোন ক্ষরণ করে যা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিকে এনজাইম ও HCl ক্ষরণে উদ্দিপ্ত করে।

**৬. এন্টারোক্রোমাফিন কোষ (Enterochromaffin cells) :** এসব কোষ **হিস্টামিন** (histamine) নিঃসরণ ও সংরক্ষণ করে।

### গ্যাস্ট্রিক জুসের উপাদান

i. **পানি :** ৯৯.৪৫%।

ii. **অজৈব পদার্থ :** ০.১৫%; HCl, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি।

iii. **জৈব পদার্থ :** ০.৪০%; মিউসিন, ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর; এনজাইম (পেপসিন, লাইপেজ ইত্যাদি)।

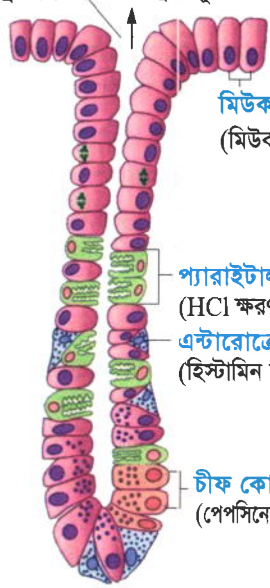

চিত্র ৩.১৪ : গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি

### গ্যাস্ট্রিক জুসের কাজ

১. গ্যাস্ট্রিক জুসের HCl (০.০৫–০.৩%) পাকস্থলিতে অম্লীয় পরিবেশ (pH = ১.৫–৩.৫) সৃষ্টি করে, ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে সক্রিয় করে।

২. গ্যাস্ট্রিক জুসে অবস্থিত **পেপসিন** এনজাইম HCl-এর সাথে মিশে প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করে।

৩. গ্যাস্ট্রিক জুস পাকস্থলির প্রাচীর সুরক্ষা করে।

৪. কিছু বিষাক্ত বস্তু, ভারী ধাতু, অ্যালকোলয়েড বস্তু ইত্যাদি গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

৫. গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান **অন্তর্নিহিত** বা **ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর** (intrinsic factor) ভিটামিন $B_{12}$ শোষণের জন্য অত্যাবশ্যক।

## ৫. আন্ত্রিক গ্রন্থি (Intestinal Glands)

অন্ত্র প্রাচীরের মিউকোসা স্তরে কতকগুলো এককোষী গ্রন্থি খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম ক্ষরণ করে। এগুলো হচ্ছে **ব্রাশকোষ, গবলেট কোষ** (মিউকাস ক্ষরণ করে), **প্যানেথ কোষ** (অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইড ও প্রোটিন ক্ষরণ করে), **আর্জেন্টাফিন কোষ** (সেরোটোনিন ক্ষরণ করে), **লিবারকুন-এর গ্রন্থি** (এনজাইম ক্ষরণ করে) এবং **ব্রুনার-এর গ্রন্থি** (ক্ষারীয় মিউকাস ক্ষরণ করে)। এসব গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত রসকে **আন্ত্রিক রস** বা **সাক্কাস এন্টারিকাস** (Intestinal juice or Succus entericus) বলে। এটি ক্ষারজাতীয় রস এবং এর pH মান ৭.৫–৮.৫।

চিত্র ৩.১৫ : আন্ত্রিক গ্রন্থি

## মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের প্রধান কার্যাবলি

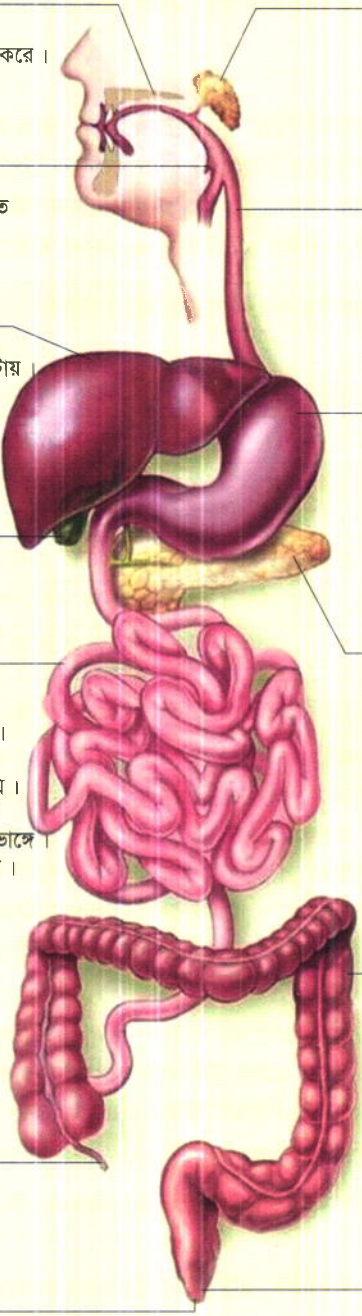


চিত্র ৩.১৬ : মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র

### আন্ত্রিক রসের উপাদান

i. পানি: ৯৮.৫% ।

ii. অজৈব পদার্থ : ০.৮%; সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ ।

iii. জৈব পদার্থ : ০.৭%; **সক্রিয়ক**– এন্টেরোকাইনেজ; **এনজাইম**– পেপটাইডেজ, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, ল্যাক্টেজ, সুক্রেজ, লাইপেজ ইত্যাদি ।

### আন্ত্রিক রসের কাজ

১. আন্ত্রিক রসের **মিউকাস** অন্ত্র প্রাচীরকে বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া থেকে রক্ষা করে ।

২. এতে উপস্থিত সক্রিয়ক **এন্টেরোকাইনেজ** নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনকে ট্রিপসিনে পরিণত করে ।

৩. এ রসের **সুক্রেজ** ও **ল্যাক্টেজ** এনজাইম যথাক্রমে, সুক্রোজ ও ল্যাক্টোজ শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে ।

৪. এতে অবস্থিত পেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে ।

**এনজাইম ও পিত্তরসের মধ্যে পার্থক্য**

| এনজাইম | পিত্তরস |
|---|---|
| ১. এনজাইম নালিযুক্ত গ্রন্থি নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ । | ১. পিত্তরস যকৃত নিঃসৃত মিশ্র তরল পদার্থ । |
| ২. এনজাইম পানি ও প্রোটিন জাতীয় জৈব পদার্থ । | ২. পিত্তরসে পানি, জৈব ও অজৈব পদার্থ থাকে । |
| ৩. এনজাইম গ্রন্থি থেকে তাৎক্ষণিক উৎপন্ন হয় এবং কোথাও সঞ্চিত থাকে না । | ৩. পিত্তরস যকৃত থেকে উৎপন্ন হয়ে পিত্তথলিতে সঞ্চিত থাকে । |
| ৪. এনজাইমের সমগ্র কার্যক্ষেত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গে । | ৪. পিত্তরসের কার্যক্ষেত্র কেবল পরিপাকনালিতে সীমাবদ্ধ । |
| ৫. এনজাইম রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে । | ৫. পিত্তরস খাদ্য পরিপাকে ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি করে । |
| ৬. এনজাইম কার্যশেষে অপরিবর্তিত থাকে । | ৬. পিত্তরস কাজ শেষে বর্জ্য হিসেবে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় । |

## পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা (Role of Nervous System & Hormone in Digestion)

মানবদেহে বিভিন্ন প্রকার শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন । এই শক্তির উৎস হচ্ছে **খাদ্য** । আমরা যে জটিল খাদ্য গ্রহণ করে থাকি তা দেহকোষের শোষণ উপযোগী করার জন্য আমাদের পরিপাকতন্ত্রে অবস্থিত পরিপাক গ্রন্থি থেকে **এনজাইম** এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে **হরমোন** নিঃসৃত হয়ে জটিল খাদ্যকে সরল ও তরল খাদ্যে পরিণত করে । মানবদেহের প্রধান পরিপাক গ্রন্থিগুলো হলো– **লালা গ্রন্থি, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি, অগ্ন্যাশয়, যকৃত** ও **আন্ত্রিক গ্রন্থি** । এসব গ্রন্থি থেকে পাচক রস নিঃসরণ প্রক্রিয়া স্নায়ু ও হরমোনের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় । নিচে পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো :

### পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা

মানুষের ক্ষুধা ও খাদ্যগ্রহণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত **ক্ষুধা কেন্দ্র** (hunger centre) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । মানুষ খাদ্য গ্রহণে উদ্দীপিত হয় যখন রক্তে গ্লুকোজ মাত্রা কমে যায় । দুটি ভিন্ন ধরনের **স্নায়ুজালক** মানুষের খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে । এগুলো হচ্ছে–

১. **বহির্নিহিত স্নায়ুজালক** বা **এক্সট্রিনসিক প্লেক্সাস** (Extrinsic plexus) এবং

২. **অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক বা ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস** (Intrinsic plexus) বা **অন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** (Enteric nervous system) ।

১. এক্সট্রিনসিক প্লেক্সাস : এগুলো স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের (autonomous nervous system) সিমপ্যাথেটিক (sympathetic) ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক (parasympathetic) শাখা থেকে আগত এবং পৌষ্টিকনালির বাইরে থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে । এরা পৌষ্টিকতন্ত্রের দীর্ঘ প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে । যেমন–খাদ্যের ঘ্রাণ নিয়ে, স্বাদ গ্রহণ করে বা খাদ্য দেখে খাদ্যের প্রতি সাড়া দেওয়া ।

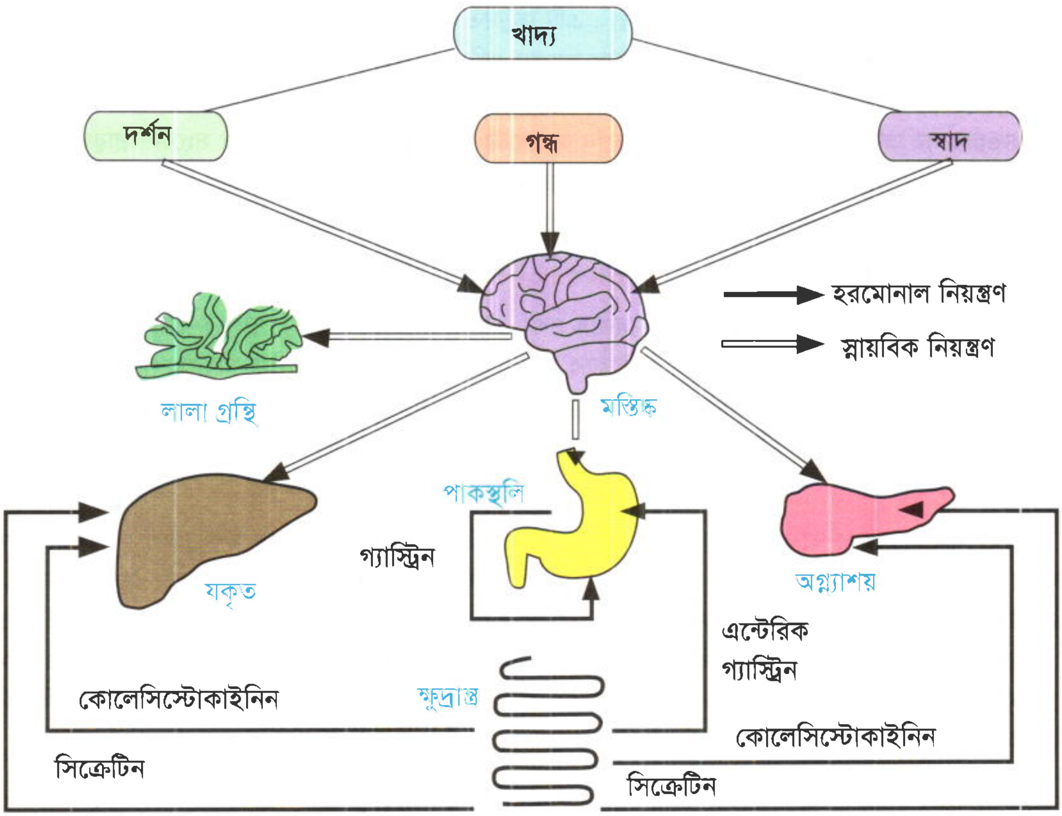


চিত্র ৩.১৭ : পরিপাকে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র ও কিছু হরমোনের ভূমিকা

২. ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস : এগুলো পৌষ্টিকনালি জুড়ে বিশেষ করে অন্ননালি, পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র ও কোলনের প্রাচীরে বিস্তৃত থাকে। এরা পৌষ্টিকনালির ভিতর থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। নিচে বর্ণিত দুধরনের ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস পৌষ্টিকতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

**ক. মায়েনটেরিক স্নায়ুজালক (Myenteric plexus)** : এটি পৌষ্টিকতন্ত্রের মসৃণ পেশিগুলোর **সঙ্কোচন** বা **পেরিস্ট্যালসিস** (peristalsis) প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

**খ. সাবমিউকোসাল স্নায়ুজালক (Submucosal plexus)** : এটি পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের ক্ষরণ ও স্থানীয় রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

[MAT 24-25]

ইনট্রিনসিক প্লেক্সাসকে বিজ্ঞানীরা মানুষের **দ্বিতীয় মস্তিষ্ক** (second brain) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কারণ এটি খাদ্যের পুষ্টিগণ ও পরিমাণ দেখে এর সাড়া প্রদান করার ক্ষমতা পরিবর্তন করতে পারে।

১. লালা ক্ষরণ (Secretion of Saliva) : লালা গ্রন্থি ক্ষরিত লালার প্রভাবে মুখগহ্বরে খাদ্যের পরিপাক হয়। লালা ক্ষরণ সম্পূর্ণরূপে স্নায়বিক। দুধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া লালা ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে, যথা – **অনপেক্ষ প্রতিবর্ত** ও **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত**। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

ক. অনপেক্ষ প্রতিবর্ত (Unconditional reflex) : এটি সহজাত অর্থাৎ জন্মগত এবং শর্তহীন। খাদ্যবস্তুর চর্বণ, স্বাদ গ্রহণ প্রভৃতি সংবেদী (sensory) উদ্দীপনা অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে সক্রিয় করে। মুখগহ্বরে খাদ্য প্রবেশের সাথে সাথে অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। জিহ্বার স্বাদকুড়ির রিসেপ্টর খাদ্যের স্বাদে উদ্দীপ্ত হয়। এসব রিসেপ্টর থেকে সংবেদী স্নায়ুতন্ত স্নায়ু উদ্দীপনাকে মস্তিষ্কে নিয়ে যায়। মস্তিষ্ক থেকে এ স্নায়ু উদ্দীপনার রেসপন্স বা সাড়া চেষ্টীয় (motor) স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে লালা গ্রন্থিতে (ক্রিয়াস্থান) এসে লালা ক্ষরণ ঘটায়।

খ. সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (Conditional reflex) : এটি জন্মগত নয় বরং এটি অভিজ্ঞতা বা শিক্ষালব্ধ, তাই এটি শর্ত সাপেক্ষ। খাদ্যবস্তুর দর্শন, ঘ্রাণ প্রভৃতি অনুভূতি থেকে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদ্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি তেতুলের আচার খাওয়ার কথা চিন্তা করে বা অন্যকে খেতে দেখে তাহলে তার লালা ক্ষরণ শুরু হয়ে যাবে, যদি তার এসব খাওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে। খাদ্যবস্তুর দর্শন বা ঘ্রাণের অনুভূতি স্নায়ু উদ্দীপনারূপে সংবেদী স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছালে সেখান থেকে স্নায়ু উদ্দীপনার রেসপন্স বা সাড়া চেষ্টীয় স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে ক্রিয়াস্থান অর্থাৎ লালা গ্রন্থিতে এসে লালা ক্ষরণ ঘটায়। লালা ক্ষরণে গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল ও ফেসিয়াল স্নায়ুর ভূমিকাই মুখ্য।

২.গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ (Secretion of Gastric Juice) : গ্যাস্ট্রিক রস নিচে বর্ণিত ৩ পর্যায়ে ক্ষরিত হয়।

ক. স্নায়বিক পর্যায় (Nervous Phase) বা মস্তিষ্ক দশা (Cephalic Phase) : মুখগহ্বরে খাদ্যবস্তুর উপস্থিতি এবং এর গলাধঃকরণ এক ধরনের স্নায়ু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যা দ্রুত মস্তিষ্কের **ভেগাস স্নায়ুর** মাধ্যমে পাকস্থলিতে পৌঁছে। খাদ্যবস্তুর দর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদ এমন চিন্তায় এরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। পাকস্থলির গ্যাস্ট্রিক উদ্দীপনায় **গ্যাস্ট্রিক রস** নিঃসৃত হয়। পাকস্থলিতে খাদ্য পৌঁছার আগেই রস ক্ষরণ শুরু হয়। এটা খাদ্য গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি। স্নায়ু পর্যায় প্রায় এক ঘন্টা কাল স্থায়ী হয়।

খ. পাকস্থলিয় পর্যায় বা গ্যাস্ট্রিক পর্যায় (Gastric Phase) : এটি পাকস্থলিতে সম্পন্ন হয়। এ সময় স্নায়ু ও হরমোন উভয় সম্পৃক্ত হয়। খাদ্য পাকস্থলিতে পৌঁছালে পাকস্থলির প্রাচীর উদ্দীপ্ত হয় এবং স্নায়বিক উদ্দীপনা সাবমিউকোসা স্তরের **মেসনার'স প্লেক্সাস** (Meissener's plexus)-এ পৌঁছে। ফলে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিতে উদ্দীপনা পৌঁছালে তা সক্রিয় হয়ে গ্যাস্ট্রিক রসের ক্ষরণ ঘটায়। পাশাপাশি উদ্দীপনা মিউকোসায় অবস্থিত বিশেষ এন্ডোক্রাইন কোষকে **গ্যাস্ট্রিন** (gastrin) হরমোন ক্ষরণের জন্য প্রভাবিত করে। উভয় ক্রিয়ার ফলে হাইড্রোক্লোরিক এসিডসমৃদ্ধ **গ্যাস্ট্রিক রস** নিঃসরণ প্রায় চার ঘন্টা যাবৎ চলতে থাকে।

গ. আন্ত্রিক পর্যায় (Intestinal Phase) : পাকমন্ড/কাইম (bolus/chyme) যখন ডিওডেনামে প্রবেশ করে এর প্রাচীরের সংস্পর্শে আসে তখন হরমোনাল স্নায়বিক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। স্নায়বিক উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌঁছালে গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ বন্ধের এবং পাকস্থলি থেকে কাইমের প্রবেশ ধীরগতি হওয়ার নির্দেশনা প্রেরণ করে। এ সময় ডিওডেনামের মিউকোসা **কোলেসিস্টোকাইনিন** (cholecystokinin) ও **সিক্রেটিন** (secretin) হরমোনের ক্ষরণ ঘটায়। হরমোন দুটি রক্তস্রোতের মাধ্যমে পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয় ও যকৃতে পৌঁছে। সিক্রেটিন পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ বন্ধ করে এবং কোলেসিস্টোকাইনিন পাকস্থলি থেকে খাদ্য ডিওডেনামে আসার গতি নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. অগ্ন্যাশয় রস ও পিত্ত নিঃসরণ (Pancreatic Juice and Bile Secretion) : সিক্রেটিন এবং কোলেসিস্টোকিনিন উভয় হরমোনই অগ্ন্যাশয় রস ও পিত্ত ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সিক্রেটিন যকৃত ও অগ্ন্যাশয়কে বাই-কার্বনেট আয়ন উৎপন্নের জন্য উদ্দীপ্ত করে। ফলে অগ্ন্যাশয় রস ও পিত্ত ক্ষারীয় প্রকৃতির হয়। এ কারণে অম্লীয় অবস্থা প্রশমিত হয়। কোলেসিস্টোকাইনিন অগ্ন্যাশয়কে এনজাইম সৃষ্টির জন্য এবং পিত্তথলিকে পিত্ত নিঃসরণের জন্য উদ্দীপ্ত করে। পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় রস স্নায়ু প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। ভেগাস স্নায়ু যকৃত ও অগ্ন্যাশয়কে উদ্দীপ্ত করে পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত করে।

## পরিপাকে হরমোনের ভূমিকা

খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন এনজাইমের নিঃসরণ কয়েকটি নির্দিষ্ট হরমোন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। হরমোনগুলো পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসা স্তরের কোষ থেকে ক্ষরিত হয়ে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন রক্তবাহিকার মাধ্যমে হৃৎপিন্ডে পৌঁছে। হৃৎপিন্ড থেকে ধমনির মাধ্যমে পুনরায় পৌষ্টিকতন্ত্রে এসে পৌঁছায় এবং এনজাইম নিঃসরণ ও অঙ্গের সঞ্চালন কাজকে উদ্দীপ্ত করে। নিচে খাদ্য পরিপাক নিয়ন্ত্রণকারী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. গ্যাস্ট্রিন (Gastrin) : পাকস্থলির পাইলোরিক প্রান্তের গ্রন্থিগুলোর গাত্রের **জি-কোষ** থেকে গ্যাস্ট্রিন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে পাকস্থলির প্রাচীরে অবস্থিত গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে **গ্যাস্ট্রিক জুস** নিঃসৃত হয়। এটি HCl এর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্ননালি থেকে পাকস্থলিতে খাদ্যগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করে। [MAT 17-18; DAT 21-22, 20-21]

২. সিক্রেটিন (Secretin) : অন্ত্রের (ডিওডেনামের) মিউকোসা থেকে এ হরমোন নির্গত হয়। এর প্রভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে **অগ্ন্যাশয় রস** নিঃসৃত হয়। এটি পাকস্থলির প্রাচীরকে **পেপসিন** এনজাইম ও যকৃতকে **পিত্ত** (bile) ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। **এটি প্রথম আবিষ্কৃত হরমোন।**

৩. কোলেসিস্টোকাইনিন (Cholecystokinin) : এর অপর নাম **প্যানক্রিওজাইমিন**। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হরমোনটি অগ্ন্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। এটি পিত্তথলি থেকে **পিত্ত** বের হতেও উদ্দীপনা যোগায়।

৪. সোমাটোস্ট্যাটিন (Somatostatin) : এ হরমোনটি পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসাতে অবস্থিত **ডি-কোষ** থেকে ক্ষরিত হয়। এটি গ্যাস্ট্রিনের ক্ষরণ নিবারণ করে ফলে পাকস্থলি রসের ক্ষরণ হ্রাস পায়। এটি অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণও কমিয়ে দেয়।

৫. এন্টেরোকাইনিন (Enterokinin) : ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত এ হরমোনের প্রভাবে ইলিয়ামের প্রাচীরে অবস্থিত আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে মল্টেজ, সুক্রেজ, ইনভারটেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম নিঃসৃত হয়।

৬. পেপটাইড YY (Peptide YY) : ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অন্ত্রের ভিতর দিয়ে ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয় যাতে দক্ষতার সাথে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়।

[DAT 17-18] ৭. এন্টেরোগ্যাস্ট্রোন (Enterogastrone = Gastric Inhibitory Peptide–GIP) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে নিঃসৃত হয়। এ হরমোন পাকস্থলির বিচলন ও গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে। গ্যাস্ট্রিক সংকোচন হ্রাস করার জন্য একে **গাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড** বলা হয়।

৮. এন্টেরোক্রাইনিন (Enterocrinin) : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে এটি ক্ষরিত হয় এবং **লিবারকুন গ্রন্থিকে** (crypts of liberkuhn) উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।

৯. ডিওক্রাইনিন (Deocrinin) : এ হরমোন ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে ক্ষরিত হয়ে ব্রুনারের গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।

১০. প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (Pancreatic Polypeptide) : এটি আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সের প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোষ থেকে ক্ষরিত হয় এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে বাধা দেয়।

১১. ভিল্লিকাইনিন (Villikinin) : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে এ হরমোন নিঃসৃত হয় এবং ভিলাই-এর কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়।

১২. ভ্যাসোঅ্যাকটিভ ইনটেস্টাইনাল পেপটাইড (Vasoactive Intestinal Peptide) : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়ে অন্ত্রের প্রাচীরের রক্ত জালিকাগুলোকে প্রসারিত করে এবং গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণ বন্ধ করে।

১৩. ক্ষুধা ও তৃপ্তি নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন : কতিপয় GI পেপটাইড যেমন ভেসোঅ্যাকটিভ ইনটেস্টাইনাল পেপটাইড (VIP), গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড-I (GLP-I), প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (PP), গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড (GIP), গ্রিলিন (Ghrelin) এবং পেপটাইড YY মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে কাজ করে। খাদ্য গ্রহণের আগে রক্তে গ্রিলিন হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় যাতে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। অন্যদিকে খাদ্য গ্রহণের সময় রক্তে PP এবং PYY হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় যাতে খাবারে তৃপ্তি সৃষ্টি হয়।

***

**পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে খাদ্য পরিপাকের রূপরেখার ছক**

| পরিপাকস্থল | পরিপাকগ্রন্থি ও পরিপাক রস | পরিপাক রসের এনজাইম | প্রভাবিত খাদ্যের নাম | সরলীকৃত উপাদান |
|---|---|---|---|---|
| মুখবিবর | লালাগ্রন্থি নিঃসৃত "লালারস" | **কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী** | | |
| | | ১. টায়ালিন [MAT 21-22] | স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন | মল্টোজ |
| | | ২. মল্টেজ (অল্পমাত্রায়) | মল্টোজ | গ্লুকোজ |
| পাকস্থলি | গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত "পাকরস" | **প্রোটিন পরিপাককারী** | | |
| | | ১. পেপসিন | প্রোটিন | প্রোটিওজ ও পেপটোন |
| | | ২. জিলেটিনেজ | জিলেটিন | পেপটোন ও পলিপেপটাইড |
| | | ৩. রেনিন | কেসিন | প্যারাকেসিন |
| | | **লিপিড পরিপাককারী** | | |
| | | ১. গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ | মাখনের চর্বি | ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল |
| ক্ষুদ্রান্ত্র | অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত "অগ্ন্যাশয় রস" [DAT 17-18] | [MAT 20-21] **কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী** | | |
| | | ১. অ্যামাইলেজ | স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন | মল্টোজ |
| | | ২. মল্টেজ | মল্টোজ | গ্লুকোজ |
| | | **প্রোটিন পরিপাককারী** | | |
| | | ১. ট্রিপসিন | প্রোটিওজ ও পেপটোন | পলিপেপটাইড |
| | | ২. কাইমোট্রিপসিন | প্রোটিওজ ও পেপটোন | পলিপেপটাইড |
| | | ৩. কার্বোক্সিপেপটাইডেজ | পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজ | সরল পেপটাইড ও অ্যামিনো এসিড |
| | | ৪. অ্যামিনোপেপটাইডেজ | পলিপেপটাইড | অ্যামিনো এসিড |
| | | ৫. ট্রাইপেপটাইডেজ | ট্রাইপেপটাইড | অ্যামিনো এসিড |
| | | ৬. ডাইপেপটাইডেজ | ডাইপেপটাইড | অ্যামিনো এসিড |
| | | ৭. কোলাজিনেজ | কোলাজেন | সরল পেপটাইড |
| | | **লিপিড পরিপাককারী** | | |
| | | ১. লাইপেজ | চর্বি (লিপিড) | ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল |
| | | ২. ফসফোলাইপেজ | ফসফোলিপিড | ফ্যাটি এসিড |
| | | ৩. কোলেস্টেরল এস্টারেজ | কোলেস্টেরল এস্টার | ফ্যাটি এসিড ও কোলেস্টেরল |
| | আন্ত্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত এনজাইমসমূহ | **কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী** | | |
| | | ১. ল্যাক্টেজ | ল্যাক্টোজ | গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ |
| | | ২. মল্টেজ | মল্টোজ | গ্লুকোজ |
| | | ৩. সুক্রেজ | সুক্রোজ | গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ |
| | | ৪. অ্যামাইলেজ | স্টার্চ ও ডেক্সট্রিন | সরল শর্করা |
| | | **প্রোটিন পরিপাককারী** | | |
| | | ১. অ্যামিনোপেপটাইডেজ | পেপটাইড অণু | অ্যামিনো এসিড |
| | | **লিপিড পরিপাককারী** | | |
| | | ১. লাইপেজ | ট্রাইগ্লিসারাইড ও ডাইগ্লিসারাইড | মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড |
| | | ২. অ্যালকালাইন ফসফেটেজ | ফসফোলিপিড | ফ্যাটি এসিড, ফসফোরিক এসিড ও এদের বেস (যেমন-কোলিন) |
| | | **নিউক্লিক এসিড পরিপাককারী** | | |
| | | ১. নিউক্লিয়েজ | নিউক্লিক এসিড | মনোনিউক্লিওটাইড |
| | | ২. নিউক্লিওটাইডেজ | নিউক্লিওটাইড | নিউক্লিওসাইড ও ফসফেট গ্রুপ |
| | | ৩. নিউক্লিওসাইডেজ | নিউক্লিওসাইড | পেন্টোজ শ্যুগার ও নাইট্রোজেন বেস |

## পরিপাককৃত খাদ্যের (খাদ্যসার) শোষণ (Absorption of Digested Food)

**যে প্রক্রিয়ায় পরিপাককৃত খাদ্যসার আন্ত্রিক এপিথেলিয়ামের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহ ও লসিকায় প্রবেশ করে তাকে শোষণ বলে।**

পাকস্থলিতে খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণভাবে পরিপাক হয়না এবং পাকস্থলির প্রাচীরে ভিলাই না থাকায় সেখানে খাদ্যসার শোষণ খুব কম ঘটে। তবে পানি, অ্যালকোহল, স্যালাইন, গ্লুকোজ ও কয়েক প্রকার ওষুধ পাকস্থলিতে শোষিত হয়। আর বৃহদন্ত্র ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত না হওয়া পানির অধিকাংশই প্রধানত শোষণ করে।

পরিপাককৃত খাদ্যসার এবং ভিটামিন, পানি, খনিজ লবণ ইত্যাদি ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকোসা স্তরের **ভিলাই** (villi; একবচনে-villus) দ্বারা শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের আবরণ ভাঁজ হয়ে আঙ্গুলের মতো যে অতিক্ষেপ (০.৫ থেকে ১ মিলিমিটার দীর্ঘ) সৃষ্টি করে সেগুলোকে **ভিলাই** বলে। ভিলাই হচ্ছে পরিশোষণের একক। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম প্রধানত ক্ষরণের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে জেজুনাম ও ইলিয়াম শোষণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে কয়েক লক্ষ ভিলাই (প্রতি বর্গ মিলিমিটারে ১০–৪০টি) থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের **লুমেন** (lumen) বা ফাঁকা গহ্বরে খাদ্যকণা অতিক্রমের সময় খাদ্যসার শোষণের কাজ অব্যাহত থাকে। ভিলাইয়ের আবরণী টিস্যুর (epithelial tissue) কোষসমূহের আবার সূক্ষ্ম অভিক্ষেপ (minute projections) থাকে সেগুলোকে **মাইক্রোভিলাই** (microvilli) বলে। এগুলো একত্রিত হয়ে উপরিতলে **ব্রাশ বর্ডার** (brush border) সৃষ্টি করে শোষণতল আরও বাড়িয়ে দেয়। এ কোষগুলো পানি, খনিজ লবণ, খাদ্যসার ইত্যাদি শোষণ করে লসিকা ও রক্তসংবহনতন্ত্রে প্রেরণ করে। [MAT 14-15]

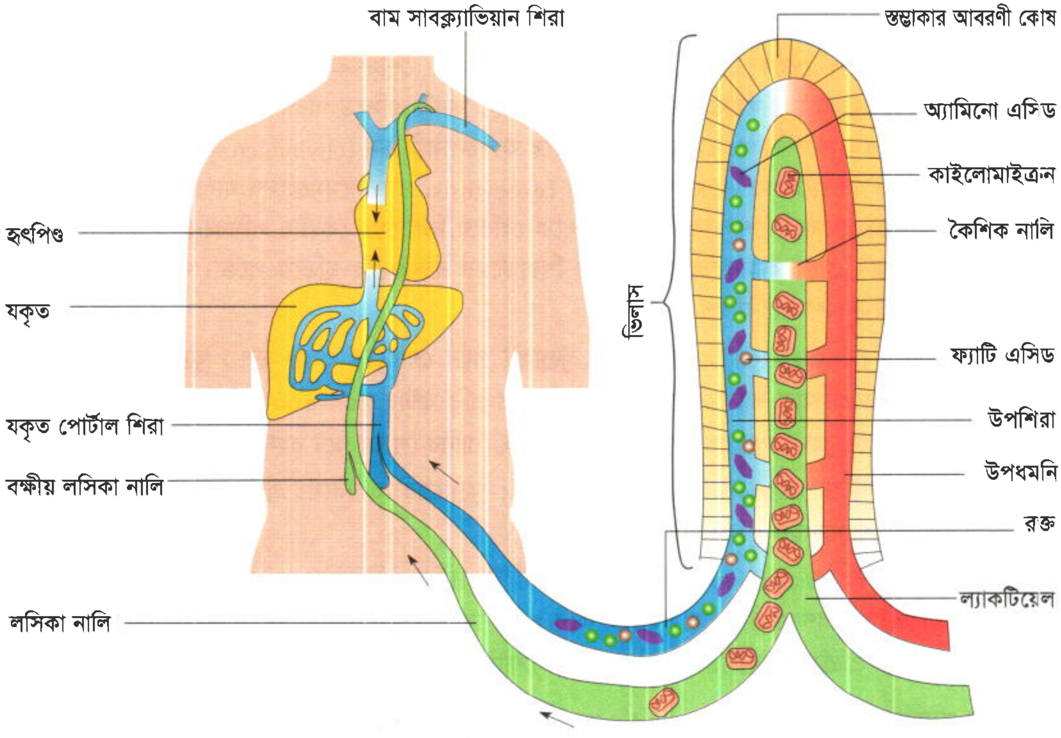


চিত্র ৩.১৮ : ভিলাসের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর শোষণ

শর্করা ও আমিষের সরল উপাদানগুলো ভিলাসের (ভিলাই এর একবচন) মধ্যে অবস্থিত রক্তে শোষিত হয়ে পোর্টাল রক্ত সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। স্নেহ দ্রব্যের সরল উপাদানগুলো ভিলাসের **ল্যাকটিয়েল** (lacteal)-এর মধ্যে শোষিত হয়ে লসিকাতন্ত্রে প্রবেশ করে। খাদ্য শোষণ প্রধানত দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়: ১. **নিষ্ক্রিয় শোষণ**–বিপাকীয় শক্তির (যেমন-ATP) প্রয়োজন হয় না এবং ২. **সক্রিয় শোষণ**–বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয়।

নিচে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসার শোষণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয়া হলো–

১. **কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা শোষণ (Absorption of Carbohydrate) :** শর্করা প্রধানত **মনোস্যাকারাইড** বা একক শর্করারূপে শোষিত হয়। শর্করা পরিপাকের পর যেসব খাদ্য উৎপন্ন হয় সেগুলো হচ্ছে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাকটোজ ইত্যাদি। ক্ষুদ্রান্ত্রের জেজুনাম অংশের ভিলাই প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষে সক্রিয় শোষণ বা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ ও অন্যান্য সরল শর্করা শোষিত হয়ে রক্তজালকের মাধ্যমে পোর্টাল সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। **ইনসুলিন** ও **গ্লুকোকর্টিকয়েড** হরমোন শর্করা শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে। [MAT 23-24, 19-20]

২. **প্রোটিন বা আমিষ শোষণ (Absorption of Protein) :** স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় আমিষ শুধু অ্যামিনো এসিডরূপে শোষিত হয়। অ্যামিনো এসিড ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম ও জেজুনাম অংশের ভিলাইয়ের প্রাচীরের এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা সক্রিয় শোষণ বা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়ে রক্তজালকের মাধ্যমে পোর্টাল সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। [DAT 20-21]
[DAT 24-25] থাইরয়েড গ্রন্থি ক্ষরিত **থাইরক্সিন** হরমোন আমিষ শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **লিপিড বা চর্বি শোষণ (Absorption of Lipid) :** লিপিডের শোষণ কিছুটা জটিল। লিপিডের পরিপাকজাত বস্তু হচ্ছে–ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল, কোলেস্টেরল, মনোগ্লিসারাইড ইত্যাদি। এর মধ্যে গ্লিসারল ও অধিকাংশ ছোট ফ্যাটি এসিড ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বর থেকে সরাসরি সরল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় (নিষ্ক্রিয় শোষণ) ভিলাসের প্রাচীরের শোষণকারী কোষে শোষিত হয় এবং সেখান থেকে পোর্টাল সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। অন্যদিকে, বড় ফ্যাটি এসিড ও মনোগ্লিসারাইড পিত্তলবণ সহযোগে **মাইসেলি** (micelle) নামক ছোট ছোট স্নেহকণা গঠন করে। কোলেস্টেরল, চর্বি দ্রাব্য ভিটামিন ইত্যাদি মাইসেলির অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষণকারী কোষের মুক্ত প্রান্তের সংস্পর্শে এলে পিত্তলবণ ছাড়া মাইসেলির অন্যান্য উপাদান মাইসেলি থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষণকারী কোষের ভিতরে প্রবেশ করে। **থায়োকাইনেজ** নামক এনজাইমের সহায়তায় ফ্যাটি এসিড সক্রিয় ফ্যাটি এসিডে পরিণত হয়। এ সক্রিয় ফ্যাটি এসিড, প্রোটিন, কোলেস্টেরল ও ফসফোলিপিড মোড়কে আবৃত হয়ে **কাইলোমাইক্রন** (chylomicron) নামক অপেক্ষাকৃত বড় স্নেহকণা গঠন করে। এসব স্নেহকণা **এক্সোসাইটোসিস** (exocytosis; প্লাজমামেমব্রেনের মাধ্যমে পদার্থসমূহ কোষের বাইরে নিষ্কাশিত হওয়া) প্রক্রিয়ায় শোষণকারী কোষ থেকে বেরিয়ে ভিলাসের কেন্দ্রীয় লসিকানালি তথা ল্যাকটিয়েলে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে লসিকাতন্ত্রের মাধ্যমে শিরাতন্ত্রের রক্তপ্রবাহে ছড়িয়ে পড়ে। থাইরয়েড গ্রন্থি-ক্ষরিত **থাইরক্সিন** হরমোন আমিষ শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. **পানি শোষণ (Absorption of Water) :** ক্ষুদ্রান্ত্রই পানি শোষণের প্রধান স্থল। ক্ষুদ্রান্ত্রে ভিলাই-প্রাচীরের আবরণী কোষে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষিত হয়। সাধারণত প্রতি ঘণ্টায় ২০০-৪০০ মিলিলিটার পানি শোষিত হয়। শোষণের পর অবশিষ্ট পানি বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে এবং ৭০–৮০% পানির শোষণ ঘটে বৃহদন্ত্রে।

৫. **খনিজ লবণ শোষণ (Absorption of Minerals) :** ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের প্রাচীরের আবরণী কোষে সক্রিয় পদ্ধতিতে খনিজ লবণ শোষিত হয়।

৬. **ভিটামিন শোষণ (Absorption of Vitamins) :** চর্বিতে দ্রবীভূত ভিটামিন (A, D, E, K) ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ে শোষিত হয়। সাধারণ পিত্তলবণ এ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। পানিতে দ্রবীভূত ভিটামিন (C ও কয়েক প্রকার B ভিটামিন) ব্যাপন ও সক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম অংশে শোষিত হয়।

## শোষিত খাদ্যসারের পরিণতি (Fate of Absorbed Food Nutrients)

**অ্যামিনো এসিড :** অ্যামিনো এসিড কোষে গৃহীত হয়ে এনজাইমের সাহায্যে প্রোটিন গঠনে ব্যবহৃত হয়। অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড যকৃতে পরিবর্তিত হয়ে একদিকে **ইউরিয়া,** অন্যদিকে **শর্করা** বা **চর্বিতে** রূপান্তরিত হয়। ইউরিয়া বর্জ্য পদার্থ। শর্করা বা চর্বি শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

**গ্লুকোজ :** গ্লুকোজ থেকে কোষে শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু গ্লুকোজ অন্যান্য বস্তুর সাথে মিলিত হয়ে প্রোটোপ্লাজমের মেটালিক উপাদান গঠন করে এবং কিছু গ্লুকোজ যকৃত ও পেশিতে **গ্লাইকোজেন** হিসেবে জমা থাকে।

**ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল :** ফ্যাটি এসিডের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রাণী নিজ দেহের উপযোগী চর্বি তৈরি করে। ফ্যাটি এসিড প্লাজমামেমব্রেন ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন গঠনে ব্যবহৃত হয়। চর্বির শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা গ্লুকোজের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

**শোষিত খাদ্যসারের পরিবহন ও পরিণতির প্রবাহচিত্র :**

- গ্লুকোজ $\xrightarrow{\text{সক্রিয় পরিবহন}}$ অন্ত্রের ভিলাস → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃত → হৃৎপিণ্ড → কোষ → শক্তি উৎপাদন অথবা গ্লাইকোজেন গঠন।
- অ্যামিনো এসিড $\xrightarrow{\text{সক্রিয় পরিবহন}}$ অন্ত্রের ভিলাস → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃত → হৃৎপিণ্ড → কোষ → প্রোটিন গঠন অথবা ইউরিয়া উৎপাদন।
- ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল $\xrightarrow{\text{নিষ্ক্রিয় পরিবহন}}$ অন্ত্রের ভিলাস → ল্যাকটিয়েল → থোরাসিক লসিকা নালি → শিরাতন্ত্র → যকৃত → হৃৎপিণ্ড → কোষ → চর্বি গঠন অথবা শক্তি উৎপাদন।

## বৃহদন্ত্র (Large Intestine)

**গঠন :** খাদ্যের পরিপাক এবং পরিপাককৃত খাদ্য দেহে শোষণের পর যে অংশটুকু অপাচ্য থাকে বা শোষিত হয় না, তা বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের পিছন থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা, নলাকার ও খাঁজযুক্ত অংশকে **বৃহদন্ত্র** বলে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৫ মিটার। এটি তিন অংশে বিভক্ত। যথা–

(i) সামনের ইলিয়াম সংলগ্ন স্ফীত গোল অংশটি **সিকাম** (caecum),

(ii) মাঝের উল্টো U আকৃতির বড় অংশটি **কোলন** (colon) এবং

(ii) পিছনের পায়ু সংলগ্ন থলি আকৃতির অংশটি **মলাশয়** (rectum)।

সিকামের সাথে একটি বদ্ধ ধরনের থলি যুক্ত থাকে, এর নাম **অ্যাপেনডিক্স** (appendix)।

কোলনের আবার ৪টি অংশ রয়েছে–

১. **ঊর্ধ্বগামী কোলন** (Ascending colon),
২. **অনুপ্রস্থ কোলন** (Transverse colon),
৩. **নিম্নগামী কোলন** (Descending colon) এবং
৪. **সিগময়েড কোলন** (Sigmoid colon)।

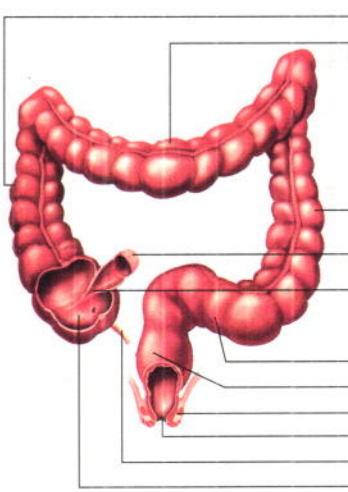


চিত্র ৩.১৯ : বৃহদন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

**কাজ :** মানুষের বৃহদন্ত্র প্রধানত নিচে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করে–

**১. ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া (Bacterial actions) :** বৃহদন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া (প্রায় ৫০০ প্রজাতির) **মিথোজীবী** হিসেবে বাস করে এবং খাদ্যের অপাচ্য অংশের **গাঁজন** ও **পাচন** ঘটায়। ব্যাকটেরিয়া বৃহদন্ত্রে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ও অপাচ্য পলিস্যাকারাইডকে গাঁজন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে অ্যাসিটিক এসিড, বিউটারিক এসিড ইত্যাদি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ফ্যাটি এসিড (short chain fatty acid) উৎপন্ন করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন ও মিথেন গ্যাস

মুক্ত করে। স্বল্পদৈর্ঘ্য ফ্যাটি এসিড ব্যাকটেরিয়া ও কোলনের প্রাচীর-কোষে শক্তি জোগায়। বৃহদন্ত্রে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন K ও $B_{12}$-এর ফলিক এসিড উৎপন্ন করে।

২. শোষণ : ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে আগত পরিপাক-বর্জ্যে অবস্থিত পানি অভিস্রবণের মাধ্যমে বৃহদন্ত্রে শোষিত হয়ে কঠিন মলের আকার ধারণ করে। কিছু পরিমাণ অজৈব লবণ, গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফলিক এসিড, ভিটামিন-B এবং K বৃহদন্ত্রে শোষিত হয়।

৩. ক্ষরণ : বৃহদন্ত্রের মিউকোসা স্তরে অবস্থিত **গবলেট কোষ** (goblet cell) মিউকাস ক্ষরণ করে বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগকে পিচ্ছিল রাখে। [MAT 19-20]

৪. খাদ্যের অসার অংশ সঞ্চয় : ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক ও শোষণের পর খাদ্য ও পাচকরসগুলোর অবশিষ্ট উপাদান ইলিওকোলিক পেশিবলয় অতিক্রম করে সিকাম ও কোলনে প্রবেশ করে এবং সেখানে দীর্ঘসময় জমা থাকে।

৫. মল উৎপাদন : দৈনিক প্রায় ৩৫০ গ্রাম **তরল মন্ড** বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। মন্ড থেকে শোষণের মাধ্যমে প্রায় ১৩৫ গ্রাম **আর্দ্র মল** (faeces) উৎপন্ন হয়।

৬. বর্জ্যবস্তু নিষ্কাশণ: বৃহদন্ত্রের মাধ্যমে মল পায়ুনালি দিয়ে পায়ুপথে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

### মলত্যাগ (Defaecation)

যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যের অপাচ্য অংশ মলরূপে দেহের বাইরে নির্গত হয় তাকে **মলত্যাগ** বা **ডেফিকেশন** বা **ইজেসশন** (egestion) বলে। খাদ্যের অপাচ্য, অশোষিত ও দেহে পুষ্টিমূল্যহীন বস্তুকে **রাফেজ** (roughage) বলে। এ রাফেজ বিশেষ প্রক্রিয়ায় মলে পরিণত হয়। বৃহদন্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত মিউকাস **লুব্রিক্যান্ট** (lubricant) এর মতো কাজ করে ফলে মল নির্গমন সহজ হয়। মল বৃহদন্ত্রে কয়েক ঘন্টা অবস্থান করে। এ সময়ের ভিতর ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে বিভিন্ন সালফারঘটিত গ্যাস (যেমন-হাইড্রোজেন সালফাইড) উৎপন্ন হয় এবং মল দুর্গন্ধযুক্ত হয়। মল মলাশয়ে প্রবেশ করলে মলাশয়ের প্রাচীরে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা থেকে **ডেফিকেশন প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (defaecation reflex) ঘটে। ফলে কোলনে **পেরিস্ট্যালসিস** শুরু হয় এবং মলকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। উদর পেশি এবং ডায়াফ্রামের ঐচ্ছিক সঙ্কোচনের ফলে পায়ুনালির ভিতরে স্ফিংক্টার পেশি শিথিল হয় এবং মল পায়ুপথে দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে।

**পরিপাক ও শোষণের মধ্যে পার্থক্য**

| পার্থক্যের বিষয় | পরিপাক (Digestion) | শোষণ (Absorption) |
|---|---|---|
| ১. প্রক্রিয়া | জটিল ও অদ্রবণীয় খাদ্যবস্তু যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে সরল ও দ্রবণীয় খাদ্যসারে পরিণত হয়। | পরিপাককৃত খাদ্যসার রক্ত ও লসিকায় প্রবেশ করে। |
| ২. সংঘটনস্থল | মুখবিবর, পাকস্থলি ও অন্ত্রের গহ্বরে সংঘটিত হয়। | অন্ত্রের ইলিয়াম ও জেজুনামের ভিলাইয়ে সংঘটিত হয়। |
| ৩. এনজাইমের প্রয়োজনীয়তা | এ প্রক্রিয়ায় এনজাইমের প্রয়োজন হয়। | এনজাইমের প্রয়োজন হয় না। |
| ৪. শক্তির প্রয়োজনীয়তা | এটি একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া এবং এতে জৈব শক্তির প্রয়োজন হয়। | এটি নিষ্ক্রিয় ব্যাপন প্রক্রিয়া এবং এতে কোন জৈব শক্তির প্রয়োজন হয় না। |
| ৫. খাদ্যের পরিবর্তন | খাদ্যের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। | খাদ্যের গাঠনিক কোনো পরিবর্তন ঘটে না। |
| ৬. রক্তের ভূমিকা | পরিপাকে রক্তের কোনো প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা নেই। | শোষণে রক্তের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা আছে। |

# ব্যবহারিক অংশ

## স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

### ❑ যকৃতের অনুচ্ছেদ (Section through liver)

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১. যকৃত কতকগুলো ক্ষুদ্র খন্ড বা **হেপাটিক লোবিউল** (lobule)-এ বিভক্ত।
২. প্রত্যেক লোবিউল অসংখ্য বহুভুজাকার **হেপাটিক কোষ** (hepatic cell)-এ গঠিত।
৩. বহুভুজাকার কোষগুলো এক বা দ্বিনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট।
৪. লোবিউলের মাঝে মাঝে **সাইনুসয়েড** (sinusoid) নামক ফাঁকা স্থান থাকে।
৫. প্রত্যেক লোবিওলের কেন্দ্রে একটি **কেন্দ্রীয় শিরা** অবস্থিত। কোষের মাঝে মাঝে রয়েছে কৈশিকনালি ও পিত্তনালি।

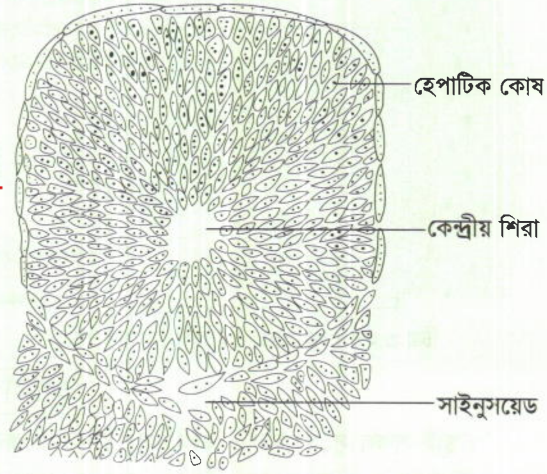


চিত্র ৩.২০ : যকৃতের অনুচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

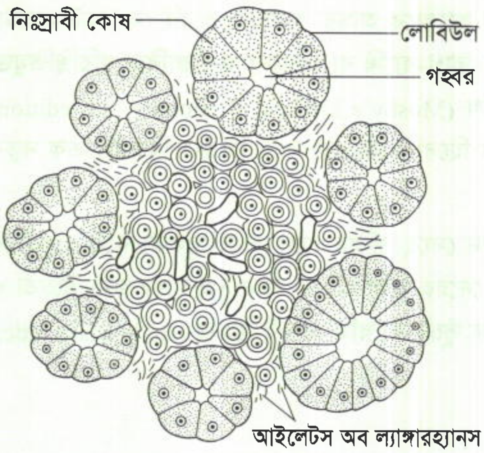


চিত্র ৩.২১ : অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

### ❑ অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১. ক্ষরণকারী কোষে গঠিত ও কেন্দ্রীয় গহ্বরযুক্ত **লোবিউল** বা **অ্যাসিনাস** (acinus) উপস্থিত।
২. লোবিওলের ফাঁকে ফাঁকে **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (Islets of Langerhans) নামক কোষপুঞ্জ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত।
৩. কোষগুলোর মধ্যে রক্তনালি ও অগ্ন্যাশয় নালি আছে।
৪. অ্যাসিনাসগুলোর ফাঁকে ফাঁকে যোজক টিস্যু দেখা যায়।

### ❑ পাকস্থলির প্রস্থচ্ছেদ

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১. প্রাচীর পাঁচটি পর্যায়ক্রমিক স্তরে বিভক্ত, যথা–সেরোসা, পেশিস্তর, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা।
২. পেশিস্তর বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য ও অন্তঃস্থ বৃত্তাকার পেশিতে গঠিত। সাবমিউকোসা অ্যারিওলার যোজক টিস্যুতে নির্মিত এবং রক্তনালি, স্নায়ু প্রভৃতি ধারণ করে।
৩. মিউকোসা স্তর থেকে **রুগী** (rugae) নামক কতকগুলো অভিক্ষেপ বের হয়েছে।
৪. মিউকোসায় **গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি** (gastric gland) দেখা যায়।

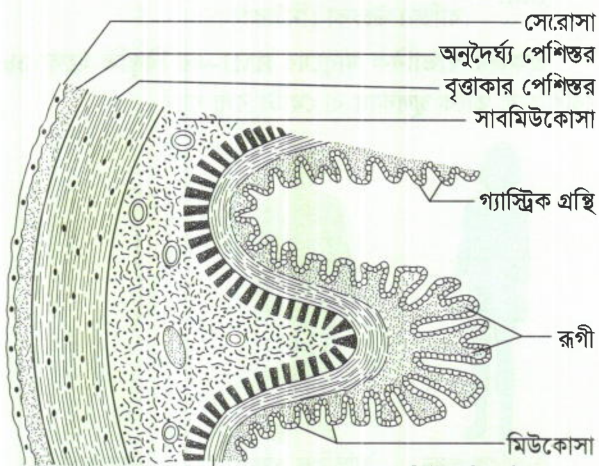


চিত্র ৩.২২ : পাকস্থলির প্রস্থচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

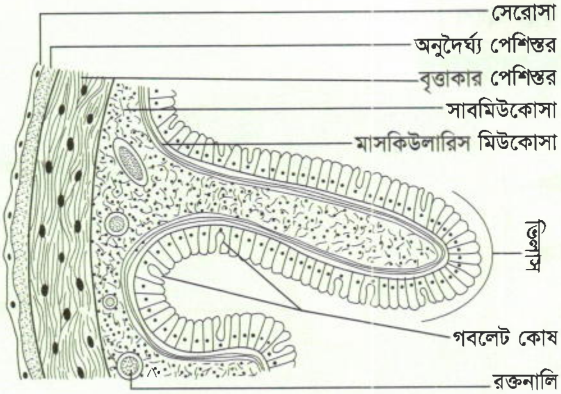


চিত্র ৩.২৩ : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রস্থচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

### ❑ ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রস্থচ্ছেদ

**শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**

১. সেরোসা, পেশিস্তর, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা স্তর বিদ্যমান।
২. পেশিস্তর বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য ও অন্তঃস্থ বৃত্তাকার পেশিতে গঠিত।
৩. সাবমিউকোসা অ্যারিওলার যোজক টিস্যুতে নির্মিত এবং রক্তনালি ও স্নায়ু সমৃদ্ধ।
৪. মিউকোসা থেকে **ভিলাই** (villi; একবচনে– villus) নামের আঙ্গুলের মতো কতগুলো অভিক্ষেপ বের হয়। মিউকোসাতে গবলেট ও শোষণক্ষম কোষ রয়েছে। [MAT 21-22, 20-21] [DAT 19-20]

## স্থূলতা (Obesity)

'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'– একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় প্রবচন। আগে সাধারণ মানুষের চোখে স্বাস্থ্যবান মানুষ বলতে দীর্ঘকায় ও মোটা-সোটা ব্যক্তিকে বোঝাত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আমরা জানতে পেরেছি যে 'মোটা-সোটা' ব্যক্তি মানেই স্বাস্থ্যবান মানুষ নয়। স্বাস্থ্যের আধুনিক সংজ্ঞা হচ্ছে : **রোগ-ব্যাধি বা অন্যান্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতিমুক্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক মঙ্গলকর অবস্থাকে স্বাস্থ্য বলে** (Mosby's Medical Dictionary, 8th edition, 2009)। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী, স্থূলতাকে স্বাস্থ্যের পরিবর্তে অসুস্থতা হিসেবে বিবেচনা করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে।

**আদর্শ দৈহিক ওজনের ২০% বা তারও বেশি পরিমাণ মেদ দেহে সঞ্চিত হলে তাকে স্থূলতা বলে**। স্থূলতার ফলে দেহের ওজন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। পূর্ণবয়স্ক মানুষে দেহের মাত্রাতিরিক্ত ওজন নির্ধারণের জন্য উচ্চতা ও ওজনের যে আনুপাতিক হার উপস্থাপন করা হয় তাকে **দেহের ওজন সূচক** বা **বডি মাস ইনডেক্স** (Body Mass Index = BMI) বলে। BMI কে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়। [DAT 23-24]

$$BMI = \frac{\text{দেহের ওজন (কিলোগ্রাম)}}{\text{ব্যক্তির উচ্চতা (মিটার}^2)}$$

**একজন স্বাভাবিক মানুষের BMI-এর বিস্তৃতি হলো ১৮.৫০–২৪.৯৯ পর্যন্ত** অর্থাৎ এই মান ২৫ বা তার চেয়ে বেশি হলে তাকে **স্থূলকায় বা মোটা** বলা যাবে।

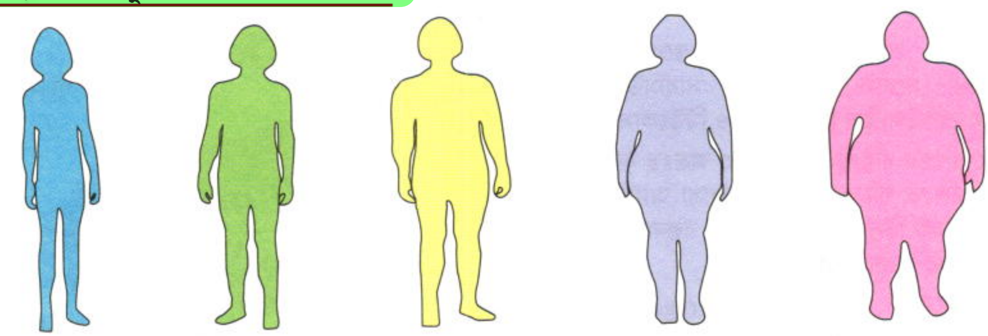


চিত্র ৩.২৪ : BMI নির্ণয়

পাশাপাশি এই মান ১৮.৫ এর নিচে হলে তাকে নিম্ন মাত্রার ওজন ধরা হয়। তবে মাত্রা যদি ৫০-১০০ হয় তবে এই স্থূলতাকে **মরবিড স্থূলতা** (morbid obesity) বা ব্যাধিগ্রস্থ **বিভৎস স্থূলতা** বলে। ২০০০ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) BMI-এর এই মান নির্দেশিকা প্রকাশ করে। এর সাহায্যে অতি সহজে মানুষের স্থূলতা নির্ণয় করা যায়। BMI-এর মান নির্দেশিকাটি নিচের ছকে প্রকাশ করা হলো –

| ক্রমিক | বিএমআই (BMI) | মানুষের শ্রেণি |
|---|---|---|
| 1 | $<18.5$ kg/m$^2$ | শরীরের ওজন কম (Underweight) |
| 2 | $18.5 - 24.99$ kg/m$^2$ | স্বাভাবিক ওজন (Normal weight) |
| 3 | $25.0 - 29.99$ kg/m$^2$ | অতিরিক্ত ওজন (Overweight) |
| 4 | $30.0 - 34.99$ kg/m$^2$ | ১ম শ্রেণির স্থূলতা (Class I obesity) |
| 5 | $35.0 - 39.99$ kg/m$^2$ | ২য় শ্রেণির স্থূলতা (Class II obesity) |
| 6 | $\geq 40.0$ kg/m$^2$ | ৩য় শ্রেণির ঝুঁকিপূর্ণ স্থূলতা (Class III obesity) |

স্থূলতার ব্যাপকতায় সারা পৃথিবীর চিকিৎসা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে আজ স্থূলতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি শাখাও সৃষ্টি হয়েছে। **চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় স্থূলতার কারণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে ব্যারিয়াট্রিকস** (Bariatrics) **বলে**। স্থূলতার কারণে যে সব রোগ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে–করোনারি হৃদরোগ, টাইপ–২ ডায়াবেটিস, ক্যান্সার (স্তন, কোলন), উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, যকৃত ও পিত্তথলির অসুখ, স্লিপ অ্যাপনিয়া, অস্টিও-আর্থ্রাইটিস, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি।

### স্থূলতার কারণ (Causes of Obesity)

ব্যক্তি পর্যায়ে অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণ, কিন্তু পর্যাপ্ত কায়িক পরিশ্রম না করাকে স্থূলতার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, সামাজিক পর্যায়ে সুলভ ও মজাদার খাবার, গাড়ীর উপর নির্ভরতা বেড়ে যাওয়া এবং উৎপাদন যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারকে স্থূলতা বৃদ্ধির কারণ বলে মনে করা হয়। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যে সব কারণকে স্থূলতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী করেছেন তা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. **জিনগত** : সফল বিপাক এবং দেহে মেদ সঞ্চয় ও বিস্তারের ক্ষেত্রে **গুচ্ছ জিন** ভূমিকা পালন করে। স্থূলকায় বাবা-মায়ের সন্তান প্রায় ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে স্থূলকায় হয়। নিম্ন বিপাক হার এবং জিনগত সংবেদনশীলতা স্থূলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. **পারিবারিক জীবনযাত্রা** : পরিবারের জীবনযাত্রার উপর স্থূলতা প্রকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। খাদ্যাভ্যাস পারিবারিকভাবেই গড়ে উঠে। চর্বিযুক্ত ফাস্টফুড (বার্গার, পিৎজা ইত্যাদি) খাওয়া, ফল, সব্জি ও অপরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট (লাল চালের ভাত) না খাওয়া, অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় পান করা; দামী রেস্তোঁরায় খাওয়ার আগে ক্ষুধাবর্ধক ও খাওয়ার শেষে চর্বি ও চিনিযুক্ত ডেসার্ট (dessert) খাওয়া।

৩. **আবেগ** : বিষণ্নতা, আশাহীনতা, ক্রোধ, একঘেঁয়েমিজনিত বিরক্তি, নিজেকে ছোট ভাবা প্রভৃতি মানসিক কারণে ক্রমাগত অতিভোজন করার ফলে স্থূলতা দেখা দিতে পারে।

৪. **কর্মক্ষেত্র** : চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে ঠায় বসে থেকে কাজ করা এবং সহকর্মীদের চাপে ফাস্টফুড বা এ জাতীয় খাবার খাওয়া। কাজ শেষে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে না চেপে গাড়ি করে বাসায় ফেরা।

৫. **মানসিক আঘাত** : দুঃখজনক ঘটনাবলী, যেমন-শৈশবকালীন শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার; পিতা-মাতা হারানোর বেদনা; কিংবা বৈবাহিক বা পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি অতিভোজনকে উসকে দেয়।

৬. **বিশ্রাম** : বিশ্রামের সময় বাসায় বসে কেবল রিমোট-কন্ট্রোলড টিভি দেখা, ইন্টারনেট ব্রাউজ করা বা কম্পিউটারে গেম খেলার কারণে কায়িক পরিশ্রমের অভাবে স্থূলতা দেখা দেয়।

৭. লিঙ্গভেদ : গড়পরতায় নারীর চেয়ে পুরুষদেহে বেশি পেশি থাকে। পেশি যেহেতু অন্যান্য টিস্যুর চেয়ে বেশি ক্যালরি ব্যবহার করে (এমনকি বিশ্রামের সময়ও) পুরুষ তাই নারীর চেয়ে বেশি ক্যালরি ব্যবহার করে। এ কারণে নারী-পুরুষ একই পরিমাণ আহার করলেও নারীদেহে মেদ জমার আশঙ্কা বেশি থাকে।

৮. গর্ভাবস্থা : প্রতিবার গর্ভধারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদেহে ৪-৬ পাউন্ড ওজন বেড়ে যায়।

৯. নিদ্রাহীনতা : রাতে ৬ ঘন্টার কম ঘুম হলে দেহে হরমোনজনিত পরিবর্তন ঘটে ক্ষুধা বেড়ে যায় ফলে বেশি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করায় স্থূলতার সৃষ্টি হয়।

১০. শিক্ষার অভাব : সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকা, সুষম খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, স্থূলতার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে না জানা ইত্যাদি কারণে স্থূলতা দেখা দেয়।

১১. অসুখ : পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (Polycystic Ovary Syndrome) হলে নারীদেহে স্থূলতা দেখা দিতে পারে। তা ছাড়া, কুসিং সিনড্রোম (Cushing's Syndrome), হাইপোথাইরয়ডিজম (Hyporthyroidism) হলেও স্থূলতা হতে পারে।

১২. কতক ওষুধ : কিছু ওষুধ স্থূলতার সম্ভাবনাকে বাড়াতে পারে, যেমন–কর্টিকোস্টেরয়েডস, বিষন্নতা দূর করার ওষুধ (অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস), জন্মবিরতিকরণ বড়ি প্রভৃতি। তাছাড়া ইনসুলিন ও কিছু ডায়াবেটিক প্রতিষেধক ওষুধও স্থূলতা সৃষ্টি করে।

## স্থূলতার কারণে স্বাস্থ্যগত সমস্যা (Health Problem of Obesity)

১. স্থূলতার কারণে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ৬–৭ বছর কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে অতিমাত্রায় স্থূলতার কারণে মানুষের গড় আয়ু ১০ বছর কমে যায়।

২. স্থূলতার কারণে উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে বেশি কোলেস্টেরল, উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বেড়ে যায়।

৩. দেহে মেদের পরিমাণ বেড়ে গেলে ইনসুলিনের সাড়া প্রদান হ্রাস পায়। ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে।

৪. অতিরিক্ত মেদের কারণে পুরুষদের ৬৪% ও মেয়েদের ৭৭% ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫. অক্ষমতা, অসুস্থতা এবং কম বয়সে মৃত্যুর কারণে স্থূলাকৃতির মানুষ অস্থূলাকৃতির মানুষ অপেক্ষা কম কর্মদিবস কাজ করতে পারে।

৬. স্থূলতার কারণে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে হার্ট ডিজিজ, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, হার্ট ফেইলিওর, গর্ভাবস্থায় জটিলতা, ঋতুস্রাবজনিত অসুস্থতা, বন্ধ্যাত্ব, বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, শ্বাস-প্রশ্বাসের জটিলতা ইত্যাদি। স্থূলতার চিকিৎসার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি নতুন শাখা সৃষ্টি হয়েছে। একে **ব্যারিয়াট্রিকস** (Bariatrics) বলে। বিজ্ঞানের এ শাখায় স্থূলতার কারণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

## স্থূলতা প্রতিরোধ (Prevention of Obesity)

স্থূলতাজনিত ঝুঁকির মধ্যে কেউ থাক বা না থাক সবারই এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। স্থূলতা প্রতিরোধের জন্য নিচে উল্লেখিত আচরণ-কেন্দ্রিক বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ, পালন ও অনুসরণ করতে হবে।

১. নিয়মিত ব্যায়াম : আমেরিকান কলেজ অব স্পোর্টস মেডিসিন এর গবেষণায় প্রতিদিন ২৫-৩০ মিনিট হালকা অথবা ভারী ব্যায়াম করলে দেহের ওজন বৃদ্ধি বন্ধ থাকে। দ্রুত হাঁটা, সাইক্লিং, সাঁতার প্রভৃতি ধরনের ব্যায়ামের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

২. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যগ্রহণ : প্রতিদিন আঁশ (fiber) যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। দানাযুক্ত খাবার (whole grain food) গ্রহণ করতে হবে এবং মিহিগুঁড়া করা (refine) খাবার কম খেতে হবে। যেমন-মিহি গুঁড়া দিয়ে তৈরি ময়দার রুটির পরিবর্তে বাদামি চালের প্রস্তুতকৃত খাবার স্থূলতা প্রতিরোধক।

৩. খাদ্য নিয়ন্ত্রণ : চর্বিযুক্ত খাবার, মিষ্টিসমৃদ্ধ আহার গ্রহণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অ্যালকোহল গ্রহণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

৪. লোভনীয় খাবার পরিহার : লোভনীয় খাবারের দিকে (ফাস্ট ফুড বা জাংক ফুড) হাত বাড়ানো ঠিক নয়। ভুক্তভোগীরা যেন আহার গ্রহণের সময় তাদের জন্য নির্ধারিত খাবার তালিকা কঠোরভাবে মেনে চলেন সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫. দেহের ওজন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা : প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত অন্তত একবার নিজের ওজন মেপে দেখতে হবে রুটিন অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণের প্রভাব কতখানি সফল হয়েছে। BMI-এর সঠিক মাত্রা বজায় রাখতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী ফল পেতে হলে খাদ্য ও ব্যায়াম সংক্রান্ত তালিকার প্রতি অটল ও বিশ্বস্ত থাকতে হবে।

৬. ফল ও সব্জি আহার : প্রধান খাবার গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে ক্ষুধা লাগলে ফল ও ফলের জুস খেতে হবে। সবুজ সালাদ একদিকে যেমন ক্ষুধা মেটায় অন্যদিকে দেহের ওজন কমায়। স্থূলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিনের খাবারে প্রচুর পরিমাণ সবুজ সব্জি ও ফলমূল যোগ করতে হবে।

৭. অব্যাহত প্রয়াসী হওয়া : দেহের ওজন বৃদ্ধিরোধের জন্য যে ব্যবস্থা নেয়া হয় তা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়াসী হওয়া। এরূপ ব্যবস্থায় যত্নবান হলে তা দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নিয়ে আসবে।

৮. বিনোদন : বাৎসরিক বিভিন্ন ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটিতে বাইরে বা দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। বাচ্চাদের টেলিভিশন দেখা, ভিডিও গেম, ফেসবুক, ইন্টারনেট ইত্যাদি বিনোদনে উৎসাহিত না করে তাদের নিয়ে মাঠে খেলতে যাওয়া, পার্কে ঘোরাঘুরি করা, রাস্তায় হাটা, বাসার ছাদে বেড়ানো ইত্যাদি কাজে উৎসাহ দিলে স্থূলতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৯. কিটোজেনিক ডায়েট : নিম্ন শর্করা ও চর্বিযুক্ত খাবারকে **কিটোজেনিক ডায়েট** (ketogenic diet) বলে। বর্তমানে চিকিৎসকগণ স্থূলতা নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের ডায়েট গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

১০. ওষুধ সেবন : ক্ষুধা কমানোর কিংবা চর্বি শোষণ রোধ করে এমন ওষুধ সেবন করে স্থূলতা রোধ করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের FDA কর্তৃক অনুমোদিত Orlistat (Xenical), Phentermine (Suprenza), Lorcaserine (Belviq) ওষুধ বর্তমানে স্থূলতা নিয়ন্ত্রণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

১১. GI হরমোন ব্যবহার : সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে কিছু **গ্যাস্ট্রো-ইনটেস্টাইনাল** (GI) হরমোন স্থূলতা দ্রুত হ্রাসকরণে **ম্যাজিক বুলেট** (magic bullet) হিসেবে কাজ করে।

১২. ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি : খাদ্যাভাস পরিবর্তন, ব্যায়াম কিংবা ওষুধে স্থূলতা না কমলে প্রয়োজনে **ল্যাপারস্কোপি** (laparscopy), **গ্যাস্ট্রিক বাইপাস সার্জারি, গ্যাস্ট্রিক স্লিভ** (gastric sleeve) ইত্যাদি Bariatric surgery করে স্থূলতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

## পৌষ্টিকতন্ত্রের কয়েকটি রোগ (Some diseases of Digestive system)

### পেপটিক আলসার (Peptic Ulcer)

পেপটিক আলসার এমন এক রোগ যার ফলে পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের (ডিওডেনাম) অন্তঃস্থ আবরণে উন্মুক্ত ঘা-এর বিকাশ ঘটে। পাকস্থলিতে হলে একে **গ্যাস্ট্রিক আলসার** (gastric ulcer) এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে হলে তাকে **ডিওডেনাল আলসার** (duodenal ulcer) বলে।

কারণ: পেপটিক আলসার হওয়ার সাধারণ কারণ হচ্ছে: *Helicobacter pylori*-র সংক্রমণ এবং জ্বালাপোড়ারোধি ওষুধ (যেমন আইবুপ্রোফেন ও নেপ্রোক্সেন সোডিয়াম)-এর দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার। চাপ (স্ট্রেস) ও মশলাদার খাবার পেপটিক আলসার সৃষ্টি করে না তবে লক্ষণগুলো আরও খারাপ করতে পারে।

**উপসর্গ:** ১. পেপটিক আলসারের সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে পেটজ্বলা। ২. অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে রয়েছে বমি বমি ভাব বা রক্তবমি, মলে কালো রক্ত, পেটভরার অনুভূতি, পেটফোলাভাব, ঢেকুর উদগীরণ, চর্বিখাদ্যে অসহিষ্ণুতা, অম্বল, বিরক্তিভাব, শ্বাস নিতে সমস্যা, অজ্ঞান বোধ করা, ওজন কমে যাওয়া এবং ক্ষুধা পরিবর্তন।

## পিত্তপাথর/পিত্তপাথুরী (Gallstone)

পিত্তথলিতে কোলেস্টেরল, বিলিরুবিন বা ক্যালসিয়াম ইত্যাদি পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন এবং পিত্তরসের সঙ্গে মিশে থাকা বিভিন্ন রঙের (হালকা বাদামি, ময়লাটে সাদা বা কুচকুচে কালো রঙের) ক্ষুদ্র দানাআকৃতির কিংবা মটর দানার মতো শক্ত দানাদার পদার্থকে **পিত্তপাথর** বলে।

**কারণ:** পিত্তে বেশি মাত্রায় কোলেস্টেরল ও বিলিরুবিন থাকে এবং পিত্তথলি যদি সম্পূর্ণ বা যথেষ্ট খালি না হয়, তাহলে পিত্ত ঘনীভূত হয়ে পিত্তপাথর গঠনে অবদান রাখে।

**উপসর্গ:** পিত্তথলিতে পাথর হলে মাংস, তেল ও মসলাজাতীয় খাবার খেলে পেটে ব্যথা হয়, সঙ্গে বমিও হয়; কাঁপনি দিয়ে জ্বর আসে; পাথর অনেক সময় পিত্তথলি থেকে বের হতে গিয়ে পিত্তনালিতে আটকে যায়, তখন বিলিরুবিনের বিপাক বন্ধ হওয়ায় জন্ডিস হতে পারে; অনেকে হেপাটাইটিসেও আক্রান্ত হয়; আক্রান্ত থলির মূল লক্ষণ পেটের ডান দিক থেকে ব্যথা শুরু হয়ে ডান কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছায়, এরকম হলে অতি জরুরী চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে।

## ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (Irritable Bowel Syndrome, IBS)

**ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম** (আইবিএস, IBS) হচ্ছে একটি সাধারণ ব্যাধি যা পাকস্থলি এবং অন্ত্রকে প্রভাবিত করে।

**কারণ:** লক্ষণগুলো হচ্ছে খিল ধরা (ক্র্যাম্পিং), পেট ব্যথা, ফোলাভাব, গ্যাস ও ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য বা উভয়ই। IBS একটি দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা যা ভুক্তভোগীকে দীর্ঘকাল সতর্ক থাকতে হয়। যে কারণে এমন অবস্থা সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে বলে মনে হয় তার মধ্যে রয়েছে: অন্ত্রের পেশি সংকোচন, স্নায়ুতন্ত্র, মারাত্মক সংক্রমণ (ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস), ও অন্ত্রের জীবাণুর পরিবর্তন।

**উপসর্গ:** IBS-এর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে আক্রান্ত হলে গুরুতর লক্ষণবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা খুব কমই দেখা যায়। কিছু মানুষ তাদের উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে খাদ্যাভ্যাস, জীবনধারা ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে। গুরুতর লক্ষণগুলো ওষুধ এবং চিকিৎসকদের উপদেশ মেনে কমানো যেতে পারে।

## লিভার সিরোসিস (Liver Cirrhosis)

দীর্ঘদিন ধরে **বি** ও **সি** ভাইরাসের আক্রমণে যকৃতে দাগ পড়ে স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি হয়, এর কার্যক্রম কমে যায় এবং ক্রীয়াশীলতা ধীরে ধীরে ব্যাহত হয়। এ অবস্থাকেই **লিভার সিরোসিস** বলে। বিশেষ করে মধ্যবয়সীদের মধ্যে সিরোসিস বেশি দেখা যায়। এর এক বড় কারণ ফ্যাটি লিভার বা যকৃতে অতিরিক্ত চর্বি জমে যাওয়া।

**কারণ:** লিভার সিরোসিসের সুনির্দিষ্ট কারণ বলা কঠিন। তা সত্ত্বেও হেপাটাইসিস রোগে ভুগলে, কোলেসিস্টিটিস, মদপান, দীর্ঘ দিনের পিত্তনালির বাধা, উইলসনের ব্যাধি, আলফা-এন্টিট্রিপসিন-এর অভাব।

**উপসর্গ:** সাধারণ উপসর্গ-অনেকদিক ধরে বি ও সি ভাইরাসের আক্রমণে যকৃতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, যকৃতের ক্রিয়াশীলতা কমে যায় ও কার্যক্রম ক্রমশ ব্যাহত হয়। একেই লিভার সিরোসিস বলা হয়ে থাকে। সিরোসিস খারাপ হওয়ার সাথে সাথে লিভার ব্যর্থ হতে শুরু করে।

**জটিল উপসর্গ:** লিভারে, ডানপাশে ব্যথা, ডানকাঁধে, বুকে ও ডানদিকে ব্যথা; মাঝে মাঝে পিত্তবমি; মুখের স্বাদ তিতা অনুভূত হয়; অজীর্ণ ও ক্ষুধাহীনতা; এবং লিভার আকারে বড় হয়; এবং শীর্ণতা, দুর্বলতা ও রক্তহীনতা দেখা দেয়।

### অ্যাপেনডিসাইটিস (Appendicitis)

অ্যাপেনডিক্সের প্রদাহকে **অ্যাপেনডিসাইটিস** বলে। **অ্যাপেন্ডিক্স** (appendix) হচ্ছে একটি আঙুল আকৃতির লম্বাটে থলি যা পেটের নিচের ডানদিকে কোলন থেকে বেরিয়ে আসে। অ্যাপেনডিসাইটিসের কারণে তলপেটে ডানপাশে ব্যথা হয়। অধিকাংশ মানুষে পেটের চারপাশে ব্যথা শুরু হয় এবং তারপরে চলে যায়। প্রদাহের সাথে সাথে অ্যাপেনডিসাইটিসের ব্যথা বেড়ে গেলে গুরুতর হতে পারে।

**কারণ:** যদিও যে কারোরই অ্যাপেনডিসাইটিস হতে পারে, তবে ১০-৩০ বছর বয়সী লোকের মধ্যে বেশি দেখা যায়। অ্যাপেন্ডিক্সের প্রাচীরে একটি ব্লকেজ থাকে, এটিও অ্যাপেনডিসাইটিসের সম্ভাব্য কারণ। ব্যাকটেরিয়ায় তখন দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, এর ফলে অ্যাপেন্ডিক্স ফুলে যায় এবং পুঁজে ভরে যায়। দ্রুত চিকিৎসা না করালে অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে যেতে পারে।

**উপসর্গ/চিকিৎসা :** অ্যাপেন্ডিসাইটিসের চিকিৎসায় সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ এবং অ্যাপেনডিক্স অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়। বয়স ও অ্যাপেনডিক্সের অবস্থানের উপর নির্ভর করে ব্যথার স্থান পরিবর্তিত হতে পারে। গর্ভাবস্থায়, ব্যথা উপরের পেট থেকে আসে বলে মনে হতে পারে কারণ গর্ভায়স্থায় অ্যাপেনডিক্স উঁচুতে থাকে। তীব্র ব্যথা কমানোর জন্যে; মানসিক অস্বস্তি দূর করতে; চিকিৎসকের পরামর্শে বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট ওষুধ দিতে হবে। অবশেষে অপারেশন করিয়ে অ্যাপেনডিক্স ফেলে দিতে হবে।

### পেট-ফাঁপা (Flatulence)

**পেট-ফাঁপা** কোন রোগ নয়, তবে অনেক রোগের লক্ষণ হিসেবে পরিচিত। পুরনো আমাশয়, অম্লরোগ, উদরাময়, জ্বর, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, কোষ্ঠকাঠিন্য, ভিটামিন-বি এর অভাবে স্নায়ু দুর্বলতা প্রভৃতির কারণে পেট ফাঁপা বোধ হতে পারে।

**উপসর্গ :** অজীর্ণ, উদরাময়, বদহজমজনিত কারণে পেট ফুলে উঠে এবং ভুটভাট করে; পুরনো আমাশয়ের জন্য ঠিকমত হজম না হলে পেট ফাঁপে, চাপ দিলে ফুলে উঠে, রোগী অস্বস্তি বোধ করে; পেট ভার মনে হয়, ক্ষুধা কমে যায়, রুচিও থাকে না; বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা জাগা সত্বেও পায়খানা হয় না।

**চিকিৎসা :** পেট-ফাঁপাজনিত কষ্টদায়ক অবস্থা থেকে স্বস্তি ও মুক্তি পেতে হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন ওষুধ (যেমন–Cap. D-Zyme, Cap. Zymet; Cap. Imotil; Cap. Nipazyme; Tab; Flagyl, Tab. Metronidazol, Tab. Metrozol; Tab. Motilon, Tab. Motocol; Tab./Sus. Lactameal ইত্যাদিসহ আরও অন্যান্য ওষুধ) খেতে হবে।

## এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. যে বস্তু খেলে প্রাণিদেহে বৃদ্ধি, পুষ্টি, শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে তাদের খাদ্য (food) বলে।

২. পরিপাক একটি জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া যেখানে জটিল, অদ্রবণীয়, অশোষণীয় খাদ্যবস্তু বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় কোষ কর্তৃক শোষণ ও আত্তীকরণ উপযোগী সরল, দ্রবণীয় ও শোষণীয় খাদ্যরসে পরিণত হয়।

৩. ভাত, রুটি, চিনি, শাক-সব্জি ইত্যাদি শর্করা জাতীয় খাদ্যের উৎস। এসব জটিল শর্করা সুনির্দিষ্ট অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইমের ক্রিয়ায় আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে সরল গ্লুকোজ-এ পরিণত হয়।

৪. মাছ, মাংস, ডিম, ডাল ইত্যাদি আমিষ জাতীয় খাদ্যের উৎস। এসব জটিল আমিষ সুনির্দিষ্ট প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের ক্রিয়ায় আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে অ্যামিনো এসিড-এ পরিণত হয়।

৫. ভোজ্যতেল, ঘি, মাখন, প্রাণিজ চর্বি ইত্যাদি স্নেহজাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস। লাইপোলাইটিক এনজাইমের ক্রিয়ায় এগুলো আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল-এ পরিণত হয়।

৬. বড় আকারের জটিল খাদ্যবস্তু দাঁতের সাহায্যে বা পাকস্থলি ও অন্ত্রের পেশির ক্রমসঙ্কোচনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে এবং অর্ধতরল মণ্ডে পরিণত হওয়াকে যান্ত্রিক পরিপাক বলে।

৭. মুখগহ্বরে অবস্থিত লালা গ্রন্থির লালারসের এনজাইম ও পৌষ্টিকনালির বিভন্ন পৌষ্টিকগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন এনজাইমের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ ও বিক্রিয়ার মাধ্যমে জটিল শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্য কোষের গ্রহণ উপযোগী ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক পরিপাক বলে।

৮. যে সংকেতের সাহায্যে স্তন্যপায়ী প্রাণিদের দাঁতের সংখ্যা, ধরণ ও বিন্যাস প্রকাশ করা হয়, তাই হলো দন্ত সংকেত। প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশে কোন ধরনের দাঁত কয়টি আছে তা দাঁতের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষরের মাধ্যমে একটি সরল রেখার উপর ও নিচে লিখে দন্ত সংকেত পাওয়া যায়।

৯. যকৃত গুরুত্বপূর্ণ পরিপাক গ্রন্থি। পরিপাকে অংশগ্রহণ ছাড়াও যকৃত অজস্র রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে বলে একে জৈব রসায়নাগার বলে।

১০. অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্রগ্রন্থি। অগ্ন্যাশয়ের লোবিউল নামক বহিঃক্ষরা বা সনালগ্রন্থি নিঃসৃত অগ্ন্যাশয় রসের নানা প্রকার এনজাইম খাদ্য পরিপাক করে এবং আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামক অন্তঃক্ষরা বা অনালগ্রন্থি নিঃসৃত ইনসুলিন ও গ্লুকাগন নামক হরমোন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

১১. পাকস্থলিতে খাদ্য প্রবেশের পর পাকস্থলির পেশির সঙ্কোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যদলা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে মিশে দলিত মথিত নরম পিচ্ছিল খাদ্যপিণ্ডে পরিণত হয়। একে কাইম (chyme) বলে।

১২. মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর জিহ্বার একেবারে গোরায় (গলবিলে) সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র নমনীয় অঙ্গবিশেষ হচ্ছে এপিগ্লটিস। খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণের সময় এটি শ্বাসরন্ধ্রকে (গ্লটিস) আবৃত করে শ্বাসনালিতে খাদ্য প্রবেশে বাধা দেয়। এপিগ্লটিস স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি ও শ্লেষ্মাস্তর দিয়ে গঠিত।

১৩. মানুষের মুখের তিনজোড়া লালা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত একপ্রকার বর্ণহীন জলীয় দ্রবণের নাম লালা। লালায় অবস্থিত মিউসিন খাদ্যদ্রব্যকে নরম ও পিচ্ছিল করে এবং টায়ালিন ও মল্টেজ এনজাইম শর্করা খাদ্যকে পরিপাক করে।

১৪. মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত বদ্ধ থলির মতো স্ফীত অংশের নাম সিকাম। মাংসাশী প্রাণীর সিকাম ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। কিন্তু অধিকাংশ তৃণভোজী প্রাণীর ক্ষেত্রে এটি বেশ বড় ও সুগঠিত থাকে। এখানে সেলুলোজ পরিপাক হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এটি একটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গ।

১৫. অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে বিদ্যমান মাইক্রোভিলাইয়ের কোষের প্লাজমা-মেমব্রেনে কতগুলো এনজাইম পরিপাক ক্রিয়ায় নিয়োজিত থেকে সর্বদা শর্করা, আমিষ ও ফসফেট জাতীয় যৌগকে পরিপাক করে। মাইক্রোভিলাই কোষের প্লাজমা-মেমব্রেনে বিদ্যমান এসব এনজাইমকে মেমব্রেন এনজাইম বলে।

১৬. খাদ্য পরিপাকের সকল প্রক্রিয়া কয়েকটি হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত সকল হরমোন পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসা স্তরের কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। এসব হরমোন রাসায়নিকভাবে পেপটাইড জাতীয় এবং সামগ্রিকভাবে গ্যাস্ট্রো-ইনটেস্টাইনাল হরমোন বা জিআই হরমোন নামে পরিচিত।

১৭. পরিপাককৃত খাদ্যবস্তুর মধ্যে গ্লুকোজ ও অ্যামিনো এসিড পৌষ্টিকনালির প্রাচীরে ভিলাই (villi)– এ অবস্থিত রক্তনালি দ্বারা পরিশোষিত হয়ে দেহে প্রবেশ করে। আর ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল ল্যাকটিয়েল তথা লিম্ফেটিক তন্ত্রের মাধ্যমে দেহে শোষিত হয়।

১৮. স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোন সমন্বয়ে একটি পরিশীলিত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দ্বারা পরিপাক-রসসমূহ যথা সময়ে ও যথাস্থানে ক্ষরিত হয়ে পরিপাক ক্রিয়া সূচারুরূপে সম্পন্ন করে। যে সকল হরমোন এই নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– গ্যাস্ট্রিন, সিক্রেটিন ও কোলেসিস্টোকাইনিন।

১৯. BMI বা Body Mass Index মানবদেহের গড়ন ও চর্বির একটি সূচনা নির্দেশ করে। দেহের মোট ওজনকে উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করে BMI নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে ওজনকে কেজি ও উচ্চতাকে মিটারে হিসাব করা হয়।

২০. দেহের ওজন অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার কারণে যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি হয় তাকেই স্থূলতা (obesity) বলে। এক্ষত্রে চর্বি জমার কারণে দেহের উচ্চতার তুলনায় ওজন অনেক বেড়ে যায় যা বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়।

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ডি-কোষ থেকে ক্ষরিত হরমোনের নাম কী ?
ⓚ সিক্রেটিন ⓚh সোমাটোস্ট্যাটিন
ⓖ গ্যাস্ট্রিন ⓖh এন্টেরোকাইনিন

২. গ্যাস্ট্রিক ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর সৃষ্টি করে কোনটি ?
ⓚ অক্সিনটিক কোষ ⓚh মিউকাস কোষ
ⓖ আর্জেন্টাফিন কোষ ⓖh জাইমোজেনিক কোষ

৩. গ্যাস্ট্রিক জুসে অজৈব পদার্থের পরিমাণ কত ?
ⓚ ০.১২% ⓚh ০.১৪% ⓖ ০.১৬% ⓖh ০.১৫%

৪. যকৃতের ম্যাক্রোফেজ হলো–
ⓚ আলফা কোষ ⓚh বিটা কোষ
ⓖ কাপফার কোষ ⓖh ডি-কোষ

৫. একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন কতটুকু লালা ক্ষরণ করে?
ⓚ ১৩০০ – ১৫০০ ml ⓚh ১২০০ – ১৪০০ ml
ⓖ ১৪০০ – ১৬০০ ml ⓖh ১২০০ – ১৫০০ ml

৬. উইর্সাং নালি মানবদেহের কোন অঙ্গে পাওয়া যায় ?
ⓚ অগ্ন্যাশয়ে ⓚh যকৃতে
ⓖ পাকস্থলিতে ⓖh কোলনে

৭. যকৃতে কোন হরমোনটি দ্রুত ধ্বংস হয় ?
ⓚ অ্যালডোস্টেরন ⓚh থাইরক্সিন
ⓖ অ্যাড্রেনাল ⓖh থাইমোসিন

৮. মানুষের প্রধান পরিপাক গ্রন্থিগুলো হলো–
i. লালাগ্রন্থি ii. গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি iii. আন্ত্রিক গ্রন্থি
**নিচের কোনটি সঠিক ?**
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

৯. আন্ত্রিক রসের কাজ–
i. অন্ত্র প্রাচীরকে বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া থেকে রক্ষা করে
ii. ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে
iii. নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনকে ট্রিপসিনে পরিণত করে
**নিচের কোনটি সঠিক ?**
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

১০. চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হলো–
i. ভিটামিন A ও E ii. ভিটামিন D ও K
iii. ভিটামিন B ও C
**নিচের কোনটি সঠিক ?**
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

১১. শর্করা জাতীয় খাদ্য শোষণ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন–
i. ইনসুলিন
ii. গ্লুকোকর্টিকয়েড
iii. থাইরক্সিন
**নিচের কোনটি সঠিক ?**
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

১২. স্নেহ পদার্থ পরিপাকের জন্য আন্ত্রিক রসগুলো–
i. লাইপেজ ii. মনোগ্লিসারাইডেজ
iii. ফসফোলাইপেজ
**নিচের কোনটি সঠিক ?**
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

১৩. অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হয়–
i. গ্যাস্ট্রিন ii. ইনসুলিন iii. ট্রিপসিন
**নিচের কোনটি সঠিক ?**
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

**উদ্দীপক থেকে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

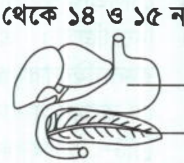


১৪. চিত্রে A চিহ্নিত অংশের নাম কী ?
ⓚ ভ্যাটারের অ্যাম্পুলা ⓚh পাকস্থলি
ⓖ যকৃত ⓖh অগ্ন্যাশয়

১৫. চিত্রে B গ্রন্থিটি যে সব অংশে বিভক্ত–
i. মস্তক ii. দেহ iii. লেজ
**নিচের কোনটি সঠিক ?**
ⓚ i ও ii ⓚh i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

| উত্তরমালা | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১. ⓚh | ২. ⓚ | ৩. ⓖh | ৪. ⓖ | ৫. ⓖh |
| ৬. ⓚ | ৭. ⓚ | ৮. ⓖh | ৯. ⓚh | ১০. ⓚ |
| ১১. ⓚ | ১২. ⓚ | ১৩. ⓖ | ১৪. ⓚh | ১৫. ⓖh |

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

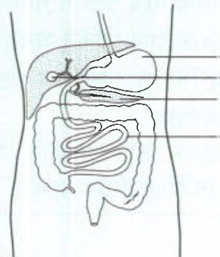


ক) কাইলোমাইক্রন কী ? ১
খ) আন্ত্রিক রস বলতে কী বোঝায় ? ২
গ) পরিপাক ক্রিয়ায় ‘D’ এর অংশের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত A, B ও C অংশের মধ্যে কাজের সমন্বয় না থাকলে কী ঘটবে– বিশ্লেষণ কর। ৪

অধ্যায় ৬

# মানব শারীরতত্ত্ব : বর্জ্য ও নিষ্কাশন

# Human Physiology : Wastes & Elimination

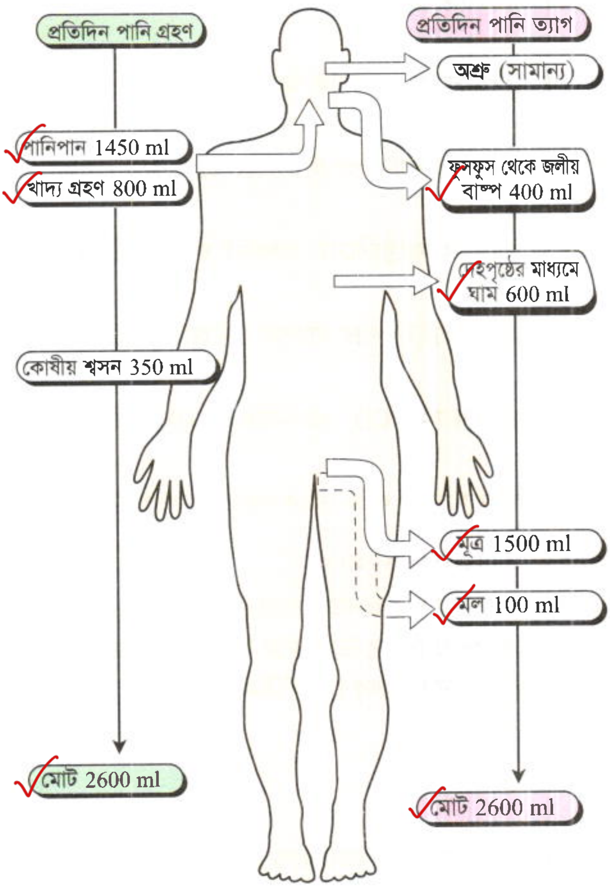


*Daily water loss and water gain by the human body*
Ref. Biological Science. By-D.J. Taylor & N.P.O Green

## প্রধান শব্দাবলি (Key words)

| | |
|---|---|
| ❒ বৃক্ক | ❒ ডিস্টাল নালিকা |
| ❒ ইউরেটার | ❒ অর্নিথিন চক্র |
| ❒ নেফ্রন | ❒ টিউবিউলার পুনঃশোষণ |
| ❒ রেনাল করপাসল | ❒ টিউবিউলার ক্ষরণ |
| ❒ বোম্যানস ক্যাপসুল | ❒ মূত্র |
| ❒ গ্লোমেরুলাস | ❒ ইউরোক্রোম |
| ❒ আল্ট্রাফিল্ট্রেশন | ❒ অসমোরেগুলেশন |
| ❒ গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট | ❒ অ্যালডোস্টেরন |
| ❒ হেনলির লুপ | ❒ ডায়ালাইসিস |
| ❒ প্রক্সিমাল নালিকা | ❒ ক্যাথেটার |

**অপচিতিমূলক বিপাক** (catabolic metabolism) এর ফলে দেহে উৎপন্ন নাইট্রোজেনঘটিত দূষিত পদার্থকে **রেচন পদার্থ** বলে। **যে প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয় তাকে রেচন (excretion) বলে,** [DAT 23-24] এবং যে তন্ত্রের মাধ্যমে এসব বর্জ্য দেহ থেকে অপসারিত হয় তাকে বলে **রেচন/ ইউরিনারি/ রেনাল** তন্ত্র (excretory/ urinary/ renal system)। মানুষের প্রধান রেচন পদার্থ হচ্ছে অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ইউরোক্রোম ইত্যাদি, এবং প্রধান রেচন অঙ্গ হচ্ছে **বৃক্ক**। এ অধ্যায়ে বৃক্কের গঠন, কাজ ও এর জটিলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

| এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব | পাঠ পরিকল্পনা | |
|---|---|---|
| ❒ বৃক্কের গঠন ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন | পাঠ ১ | মানুষের রেচনতন্ত্র |
| ❒ রেচনের শারীরবৃত্তের ব্যাখ্যা | পাঠ ২ | রেচনের শারীরবৃত্ত |
| ❒ মানব শরীরে রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের কার্যক্রমের যথার্থতা মূল্যায়ন | পাঠ ৩ | বৃক্কের ভূমিকা |
| ❒ বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের লক্ষণ ও ঐ মুহূর্তে করণীয় | পাঠ ৪ | বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয় |
| ❒ রক্ত ও মূত্রে হরমোনের ক্রিয়ার বিশ্লেষণ | পাঠ ৫ | হরমোনাল ক্রিয়া |
| ❒ **ব্যবহারিক :** বৃক্কের অনুচ্ছেদ শনাক্তকরণ ও চিত্র অঙ্কন | পাঠ ৬ | **ব্যবহারিক :** বৃক্কের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ |

## প্রাণিদের বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য পদার্থ (Different Types of Waste Products of Animals)

১. **নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ বা রেচন পদার্থ** (Nitrogenous Compound or Excretory Products) : ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া, প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড থেকে উৎপন্ন হয়। রেচন পদার্থ বিভিন্ন প্রাণীতে নিচে বর্ণিত তিন ধরনের হয়–

ক. ইউরিওটেলিক (Ureotelic) : এসব প্রাণী **ইউরিয়াকে** রেচন পদার্থরূপে ত্যাগ করে। যেমন– মানুষসহ কিছু স্থলজ ও সামুদ্রিক প্রাণী।

খ. ইউরিকোটেলিক (Uricotelic) : এসব প্রাণী **ইউরিক এসিডকে** রেচন পদার্থ হিসেবে ত্যাগ করে। যেমন– পতঙ্গ, সাপ, টিকটিকি, পাখি প্রভৃতি।

গ. অ্যামোনোটেলিক (Ammonotelic) : এসব প্রাণী **অ্যামোনিয়াকে** রেচন পদার্থ হিসেবে ত্যাগ করে। যেমন – হাইড্রা, কেঁচো ও কিছু মাছ।

২. **পিত্তরঞ্জক** (Bile Pigment) : যকৃতে পুরাতন লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের ভাঙ্গনের ফলে বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন নামক পিত্তরঞ্জক উৎপন্ন হয়।

৩. **ঘাম** (Sweat) : ত্বকে অবস্থিত ঘর্মগ্রন্থিতে (sweat gland) ঘাম উৎপন্ন হয় যার সাহায্যে দেহের অতিরিক্ত পানি, খনিজ লবণ এবং অল্প পরিমাণ ইউরিয়া নির্গত হয়।

৪. **কার্বন ডাইঅক্সাইড** : সামান্য বিপাকীয় পানি বাষ্পাকারে নিঃশ্বাসের সময় $CO_2$- এর সাথে ফুসফুস থেকে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

৫. **লবণ জাতীয় দ্রব্য** : অন্ত্রে উৎপন্ন কিছু পরিমাণ লৌহ ও ক্যালসিয়ামঘটিত লবণ রেচন পদার্থ হিসেবে উৎপন্ন হয়।

## মানুষের রেচনতন্ত্র (Human Excretory System)

রেচন পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য মানবদেহে একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট তন্ত্র রয়েছে যা **রেচনতন্ত্র** নামে পরিচিত। এর মাধ্যমেই শতকরা ৮০ ভাগ রেচন পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। বাকি ২০ ভাগ রেচন পদার্থ বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে উৎপন্ন ও বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। এসব অঙ্গ **সহকারী রেচন অঙ্গ** (যেমন– ত্বক, ফুসফুস, যকৃত, পৌষ্টিকনালি ইত্যাদি) হিসেবে কাজ করে।

[DAT 17-18] মানুষের রেচনতন্ত্র নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত–

১. একজোড়া বৃক্ক : এতে মূত্র তৈরি হয়;
২. একজোড়া রেচননালি বা ইউরেটার : বৃক্ক থেকে মূত্রকে পরিবহন করে মূত্রথলিতে প্রেরণ করে;
৩. একটি মূত্রথলি : মূত্রকে সাময়িকভাবে জমা রাখে; এবং
৪. একটি মূত্রনালি : মূত্রথলি থেকে মূত্রকে দেহের বাইরে নিক্ষেপ করে।

১. বৃক্ক (Kidney) : উদর গহ্বরের কটি অর্থাৎ কোমর অঞ্চল (lumbar region)-এ মেরুদণ্ডের দুপাশে একটি করে মোট দুটি বৃক্ক থাকে। বৃক্কের উপরের প্রান্ত দ্বাদশ থোরাসিক কশেরুকার নিচে এবং নিচের প্রান্ত তৃতীয় লাম্বার কশেরুকার উপরে অবস্থিত। উদর গহ্বরে যকৃতের অবস্থানের কারণে বাম বৃক্কটি ডান বৃক্কের তুলনায় সামান্য উপরে অবস্থিত। বৃক্ক দেখতে অনেকটা শিম বীজের মতো। এর পার্শ্বদেশ উত্তল, ভিতরের দিক অবতল।

২. রেচন নালি বা ইউরেটার (Ureter) : বৃক্কের পেলভিস থেকে সৃষ্টি হয়ে পৃষ্ঠউদরীয় প্রাচীর ঘেঁষে পশ্চাৎভাগে অগ্রসর হয়ে যে নালি মূত্রথলিতে উন্মুক্ত হয়েছে তাকে **ইউরেটার** বলে। প্রত্যেক নালি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার। এ নালি বৃক্ক থেকে মূত্রথলিতে মূত্র পরিবহন করে।

৩. মূত্রথলি (Urinary Bladder) : মূত্রথলি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট এবং **ডেট্রুসর** (detrusor) নামক অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত একটি ত্রিকোণাকার থলি বিশেষ। এটি সঙ্কোচন প্রসারণক্ষম। মূত্রথলি ৭০০-৭৫০ মিলিলিটার মূত্র ধারণ

করতে পারে। তবে ২৮০-৩২০ মিলিলিটার মূত্র মূত্রথলিতে জমা হলেই ত্যাগের ইচ্ছা জাগে। মূত্র সাময়িকভাবে ধারণ করা ও সময়ে সময়ে নিষ্কাশন করা এর কাজ।

৪. মূত্রনালি বা ইউরেথ্রা (Urethra) : পুরুষে মূত্রথলির পশ্চাৎপ্রান্ত থেকে মূত্রনালি উৎপন্ন হয়ে লিঙ্গের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষে এ নালির দৈর্ঘ্য ১৮–২২ সেন্টিমিটার। নারীদেহে মূত্রনালি একটি পৃথক ছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে উন্মুক্ত এবং এর দৈর্ঘ্য মাত্র ৩.৫–৪ সেন্টিমিটার। মূত্র দেহের বাইরে নিষ্কাশন করা এর প্রধান কাজ। তাছাড়া পুরুষের ইউরেথ্রার মাধ্যমে বীর্য দেহের বাইরে নির্গত হয়।

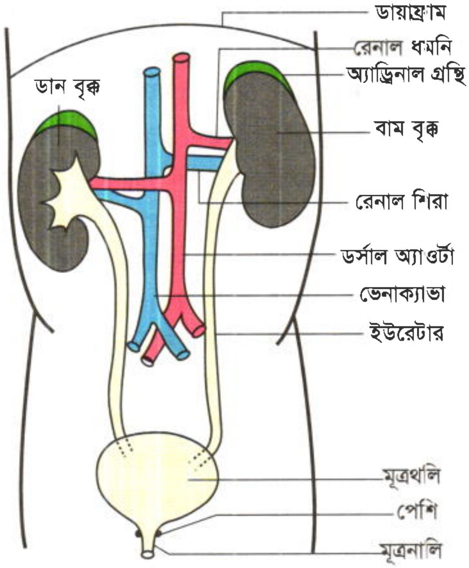

চিত্র ৬.১ : মানুষের রেচনতন্ত্র

## বৃক্কের গঠন ও কাজ

বাহ্যিক গঠন : প্রত্যেক বৃক্ক নিরেট, চাপা দেখতে অনেকটা শিম বীজ বা বাংলা "৫" সংখ্যার মতো এবং কালচে লাল রংয়ের। একটি পরিণত বৃক্কের দৈর্ঘ্য ১০–১২ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৫–৬ সেন্টিমিটার এবং স্থূলত্ব ৩ সেন্টিমিটার। এককেটির ওজন পুরুষে ১৫০–১৭০ গ্রাম এবং নারীদেহে ১৩০–১৫০ গ্রাম। বৃক্কের বাইরের দিক উত্তল ও ভিতরের দিক অবতল। অবতল অংশের ভাঁজকে **হাইলাম** (hilum) বলে। হাইলামের মধ্য দিয়ে ইউরেটার ও রেনাল শিরা বহির্গত হয় এবং রেনাল ধমনি ও স্নায়ু বৃক্কে প্রবেশ করে। বৃক্কে প্রবেশকারী **রেনাল শিরা** দেহের সবচেয়ে বড় শিরা। সম্পূর্ণ বৃক্ক **ক্যাপসুল** (capsule) নামক তন্তুময় যোজক টিস্যুর সুদৃঢ় আবরণে বেষ্টিত। বৃক্কের অগ্রপ্রান্তে **অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি** (adrenal gland) টুপির মতো আচ্ছাদন তৈরি করে সংযুক্ত থাকে।

অন্তর্গঠন : বৃক্কের লম্বচ্ছেদে তিনটি সুস্পষ্ট অংশ দেখা যায় : বাইরে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত গাঢ় অঞ্চলটি **কর্টেক্স** (cortex), মধ্যখানে হালকা লাল রঙের **মেডুলা** (medulla) এবং ভিতরে সাদাটে **পেলভিস** (pelvis)।

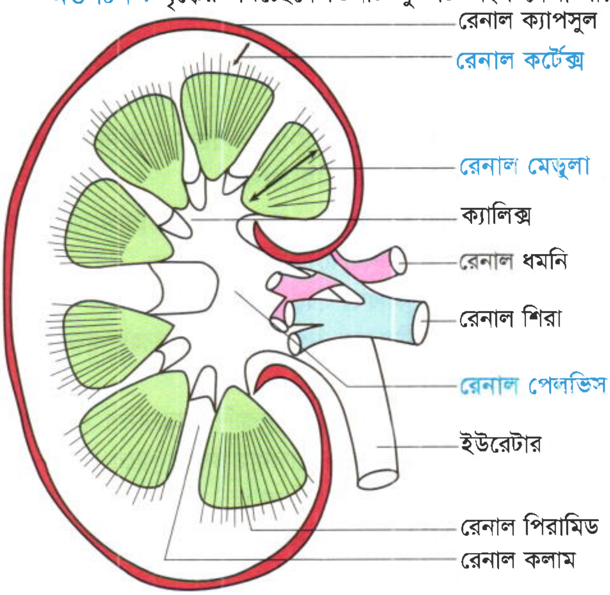

চিত্র ৬.২ : মানব বৃক্কের অন্তর্গঠন

বৃক্কের সর্ববহিঃস্থ ও শক্ত তন্তুময় যোজক টিস্যুতে এবং অসংখ্য **রেনাল করপাসল** (খালি চোখেও দেখা যায়) ও নেফ্রনের অংশবিশেষ নিয়ে **কর্টেক্স** গঠিত।

কর্টেক্সের নিচে হালকা লাল রঙের **মেডুলা** অংশ ৮–১৮টি পিরামিড আকৃতির অংশ নিয়ে গঠিত। এগুলো **রেনাল পিরামিড** (renal pyramid)। নেফ্রনের নালিকাময় অংশ ও রক্তবাহিকা নিয়ে এককেটি পিরামিড নির্মিত হয়। পিরামিডের গোড়া থাকে কর্টেক্সের দিকে, আর ১০-২৫টি ছিদ্রযুক্ত চূড়া বা **প্যাপিলা** (papilla)

থাকে রেনাল পেলভিসে উন্মুক্ত। দুই রেনাল পিরামিডের কর্টেক্সের কিছু অংশ স্তম্ভের মতো মেডুলার গভীরে প্রবেশ করেছে। এগুলোকে **রেনাল কলাম** (renal column) বলে।

বৃক্কের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইউরেটারের অংশটি উপর দিকে ফানেলের মতো প্রসারিত অংশে পরিণত হয়ে **রেনাল পেলভিস** (renal pelvis) গঠন করেছে। প্রশস্ত পেলভিসটি উপর দিকে কয়েকটি শাখা-প্রশাখায় রূপ নিয়েছে। এর মধ্যে ২-৩টি হচ্ছে প্রধান শাখা যা **মেজর ক্যালিক্স** (major calyx) নামে পরিচিত। মেজর ক্যালিক্স বিভক্ত হয়ে মোট ৮–১৪টি **মাইনর ক্যালিক্স** (minor calyx) সৃষ্টি করে। বৃক্কে মূত্র সৃষ্টি হলে প্রথমেই তা রেনাল প্যাপিলা হয়ে মাইনর ক্যালিক্সে প্রবেশ করে। এখান থেকে মূত্র মেজর ক্যালিক্স হয়ে রেনাল পেলভিস অতিক্রম করে ইউরেটারে বাহিত হয়। ক্যালিক্স, পেলভিস ও ইউরেটারের প্রাচীরে এমন এক ধরনের সংকোচনশীল উপাদান থাকে যার প্রভাবে মূত্র মূত্রথলির দিকে ধাবিত হয়।

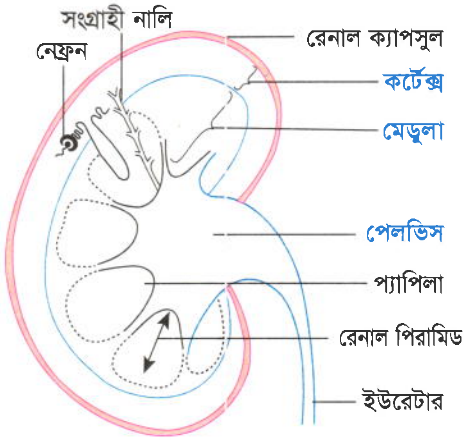


চিত্র ৬.৩ : লম্বচ্ছেদে একটি বৃক্ক (চিত্রানুগ)

[DAT 20-21, 16-17] **বৃক্কের কাজ :** মূত্র উৎপাদন বৃক্কের প্রধান কাজ হলেও এটি নিম্নলিখিত বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

১. **রক্তের পরিশোধন :** বৃক্ক দেহের বিপাকের ফলে উৎপন্ন বর্জ্যপদার্থগুলো, যেমন-ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি মূত্র সৃষ্টির মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়, ফলে রক্ত বর্জ্যমুক্ত হয়ে পরিশোধিত হয়।

২. **দেহে পানির সমতা বজায় রাখা বা অসমোরেগুলেশন :** দেহে পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হলে বৃক্ক বেশি মূত্র তৈরি করে আবার পানির ঘাটতি থাকলে কম মূত্র সৃষ্টির মাধ্যমে বৃক্ক দেহে পানির সমতা বজায় রাখে।

৩. **অন্যান্য পদার্থের অপসারণ :** বৃক্ক থেকে বিভিন্ন টক্সিক পদার্থ, ভেষজ পদার্থ, রঞ্জক, অতিরিক্ত ভিটামিন, ওষুধ ও হরমোন বহিষ্কৃত হয়; বৃক্কের মাধ্যমে রক্ত থেকে অতিরিক্ত চিনি ও অ্যামিনো এসিড অপসারিত হয়।

[MAT 19-20] ৪. **অম্ল ও ক্ষারের সমতা বজায় রাখা বা pH নিয়ন্ত্রণ :** বৃক্ক দেহের খনিজ লবণ ও বাইকার্বনেটের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অম্ল-ক্ষার সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৫. **লবণের সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ :** বৃক্ক রক্তের সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি খনিজ লবণের সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. **অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ :** বৃক্ক দেহে রক্ত ও কোষ-টিস্যুর অভিস্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

৭. **রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ :** দেহের পানির সমতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, বিভিন্ন হরমোনের সাহায্যে বৃক্ক রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৮. **রক্তের উপাদান নির্দিষ্ট রাখা :** বৃক্ক রক্তের রক্তরস ও রক্তকণিকার উপাদান নির্দিষ্ট রাখে।

৯. **হরমোন উৎপাদন:** বৃক্কে **এরিথ্রোপয়েটিন** (erythropoietin), **প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন** (prostagladin) এবং **অ্যানজিওটেনসিন** (angiotensin) হরমোন উৎপন্ন হয়। এরিথ্রোপয়েটিন এরিথ্রোসাইট (RBC) উৎপাদনে উদ্দীপনা জোগায়।

১০. **এনজাইম ক্ষরণ :** বৃক্ক **রেনিন** (renin) এনজাইম ক্ষরণ করে যার কার্যকারিতা হরমোনের মতো।

১১. **হোমিওস্ট্যাসিস (Homeostasis) :** বৃক্ক রক্ত থেকে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বস্তু অপসারণ করে দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে স্থিতিশীল রাখে।

১২. **গ্লুকোনিওজেনেসিস (Gluconeogenesis) :** দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকলে বৃক্ক গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় প্রোটিন ও লিপিড থেকে শর্করা উৎপাদন করে। এসময় বৃক্ক প্রায় ২০% গ্লুকোজ সরবরাহ করতে পারে।

১৩. **পুনঃশোষণ :** বৃক্ক দেহে পানি, গ্লুকোজ ও অ্যামিনো এসিড পুনঃশোষণের সাথে জড়িত।

১৪. **মজবুত হাড় ও দাঁতের গঠন :** বৃক্ক ভিটামিন-D এর কার্যকর রূপ তৈরিতে প্রধান ভূমিকা রাখে। ভিটামিন-D রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ক্যালসিয়াম হাড়ের গঠনে ভূমিকা রাখে।

## বৃক্কের সূক্ষ্ম গঠন (Ultra Structure of Kidney) - নেফ্রন

[DAT 19-20]

**বৃক্কের গাঠনিক ও কার্যিক একককে নেফ্রন** (nephron) **বলে**। মানুষের প্রত্যেক বৃক্কে ১০ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ নেফ্রন রয়েছে। প্রতিটি নেফ্রন প্রায় ৩ থেকে ৫ সে.মি. লম্বা। এ হিসেবে প্রত্যেক বৃক্কে নেফ্রনের নালিকাগুলো সম্মিলিতভাবে ৩৬ কি.মি. (প্রায় ২২.৫ মাইল)-এরও বেশি লম্বা হবে। এর ফলে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তৃত হয়েছে। বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে রক্ত থেকে ১২৫ ঘন সেমি. তরল পদার্থ পরিশ্রুত হয়। প্রায় ৯৯% পানিই আবার রক্তে ফিরে যায়, সাধারণত প্রতি মিনিটে কেবল ১ ঘন সেমি. মূত্র সৃষ্টি হয়।

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে **স্যার উইলিয়াম বোম্যান** (Sir Willium Bowman) প্রথম বৃক্কের সূক্ষ্ম গঠনের সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে– প্রত্যেক নেফ্রন ২টি প্রধান অংশে বিভক্ত– **রেনাল করপাসল** এবং **বৃক্কীয় নালিকা** বা **রেনাল টিউবিউলস**।

***

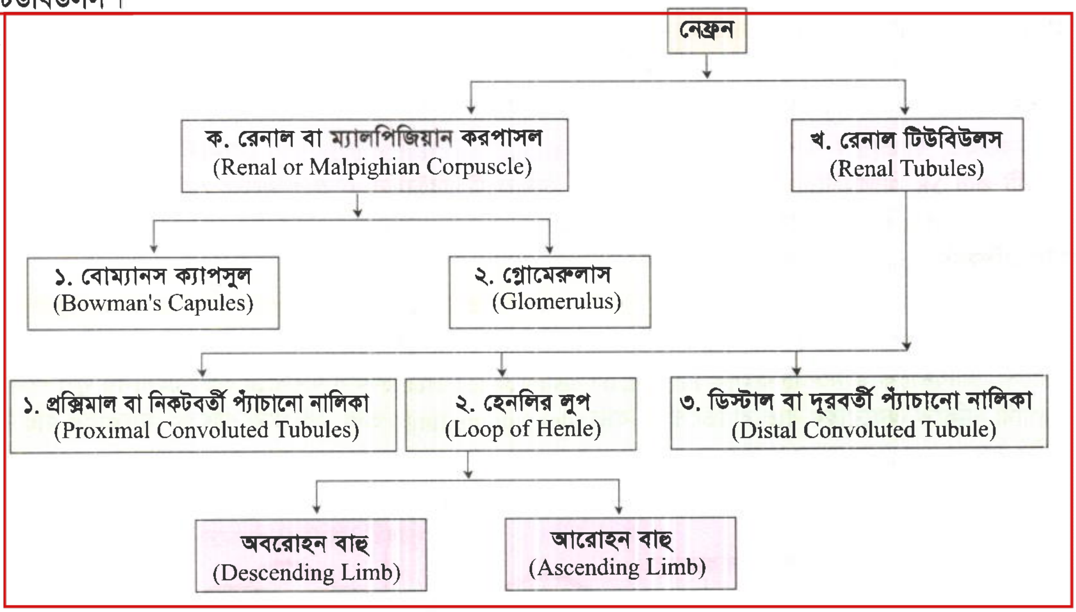


**ক. রেনাল করপাসল (Renal corpuscle, বা ম্যালপিজিয়ান করপাসল বা ম্যালপিজিয়ান বডি):** নেফ্রনের অগ্রপ্রান্তকে **রেনাল করপাসল** বলে। এটি বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থিত এবং **বোম্যানস ক্যাপসুল** (Bowman's capsule) ও **গ্লোমেরুলাস** (glomerulus) নিয়ে গঠিত।

**i. বোম্যানস ক্যাপসুল :** রেনাল করপাসলে গ্লোমেরুলার কৈশিকজালিকাগুচ্ছকে ঘিরে অবস্থিত ০.২ মিলিমিটার ব্যাসের ও আঁইশাকার এপিথেলিয়ামে গঠিত দ্বিস্তরী পেয়ালার মতো প্রসারিত অংশকে **বোম্যানস ক্যাপসুল** (Sir William Bowman-এর নামানুসারে) বলে। এর গ্লোমেরুলাস সংলগ্ন স্তরকে **ভিসেরাল স্তর** (visceral layer), বহিঃপ্রাচীরকে **প্যারাইটাল স্তর** (parietal layer) এবং দুই স্তরের মাঝখানে সংকীর্ণ গহ্বরকে **ক্যাপসুলার স্পেস** (capsular space) বলে। ভিসেরাল স্তরটি **পোডোসাইট** (podocyte) নামক বিশেষ ধরনের প্রবর্ধনযুক্ত কোষে এবং প্যারাইটাল স্তর স্বাভাবিক **আঁইশাকার এপিথেলিয়াল** কোষে নির্মিত। [DAT 20-21]

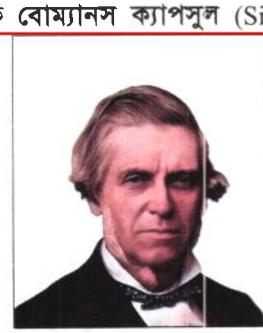

Sir William Bowman
(1816-1892)

**ii. গ্লোমেরুলাস :** বোম্যানস ক্যাপসুলের অভ্যন্তরে ঘনিষ্ঠভাবে **গ্লোমেরুলাস** অবস্থান করে। রেনাল ধমনি থেকে সৃষ্ট একটি ক্ষুদ্র **অন্তর্বাহী ধমনিকা** বা **অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল** (afferent arteriole) বোম্যানস ক্যাপসুলে প্রবেশ করে এবং ৫০-৬০টি কৈশিকজালিকায় বিভক্ত হয়ে গ্লোমেরুলাস গঠন করে। কৈশিকজালিকাগুলো পুনরায় মিলিত হয়ে **বহির্বাহী ধমনিকা** বা **ইফারেন্ট আর্টারিওল** (efferent arteriole) রূপে বোম্যানস ক্যাপসুল থেকে

বেরিয়ে আসে। ইফারেন্ট আর্টারিওলের ব্যাস অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলের চেয়ে কম হওয়ার কারণে গ্লোমেরুলাসে সব সময় উচ্চ রক্তচাপ বজায় থাকে।

**কাজ:** রেনাল করপাসল-এ রক্তের আল্ট্রাফিল্ট্রেশন ঘটে এবং রক্ত থেকে রেচনবর্জ্য, পানি ও অন্যান্য দ্রব্য পরিস্রুত হয়ে **গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট** (glumerular filtrate) হিসেবে বোম্যানস ক্যাপসুলে জমা হয়।

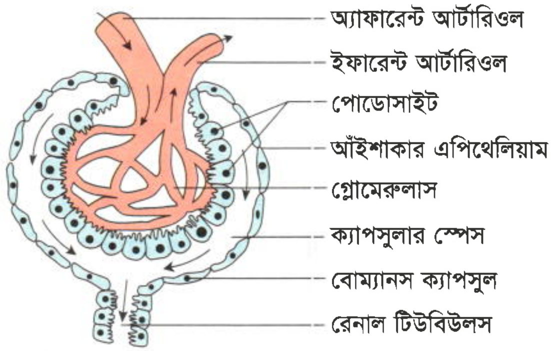


চিত্র ৬.৪ : একটি রেনাল করপাসল

**খ. বৃক্ক নালিকা বা রেনাল টিউবিউলস (Renal tubules) :** এটি নেফ্রনের পশ্চাৎঅংশ এবং বোম্যানস ক্যাপসুলের পিছন থেকে সৃষ্টি হয়ে সংগ্রাহী নালি পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেক রেনাল টিউবিউল প্রায় ৩ সেন্টিমিটার লম্বা এবং গড় ব্যাস প্রায় ৬০ মাইক্রোমিটার। এটি নিচে বর্ণিত ৩টি অংশে বিভক্ত।

**i. নিকটবর্তী বা প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকা (Proximal convoluted tubule) :** বোম্যানস ক্যাপসুলের সাথে সংযুক্ত এটি প্রায় ১৪ মিলিমিটার লম্বা প্যাঁচানো নালিকা। রেনাল টিউবিউলের এ অংশ বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থিত। এর প্রাচীর একস্তরী এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত। কোষগুলোর একপ্রান্তে অসংখ্য অতিআণুবীক্ষণিক আঙ্গুলের মতো অভিক্ষেপ বা **মাইক্রোভিলাই** (microvilli) থাকে।

[MAT 17-18, 13-14] **ii. নেফ্রন ফাঁস বা হেনলির লুপ (Loop of Henle):** নিকটবর্তী বা প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার শেষ প্রান্ত সোজা হয়ে বৃক্কের মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি U আকৃতির ফাঁস বা **লুপ** (loop) গঠন করে পুনরায় কর্টেক্স অঞ্চলে ফিরে আসে। আবিষ্কারক জার্মান চিকিৎসক Friedrich Gustav Jakob Henle-র নামানুসারে একে **হেনলির লুপ** বলে। এর নিম্নগামী নালিকে **অবরোহন বাহু** বা **ডিসেন্ডিং বাহু** (descending limb) এবং উর্ধ্বগামী নালিকে **আরোহন বাহু** বা **অ্যাসেন্ডিং বাহু** (ascending limb) বলে।

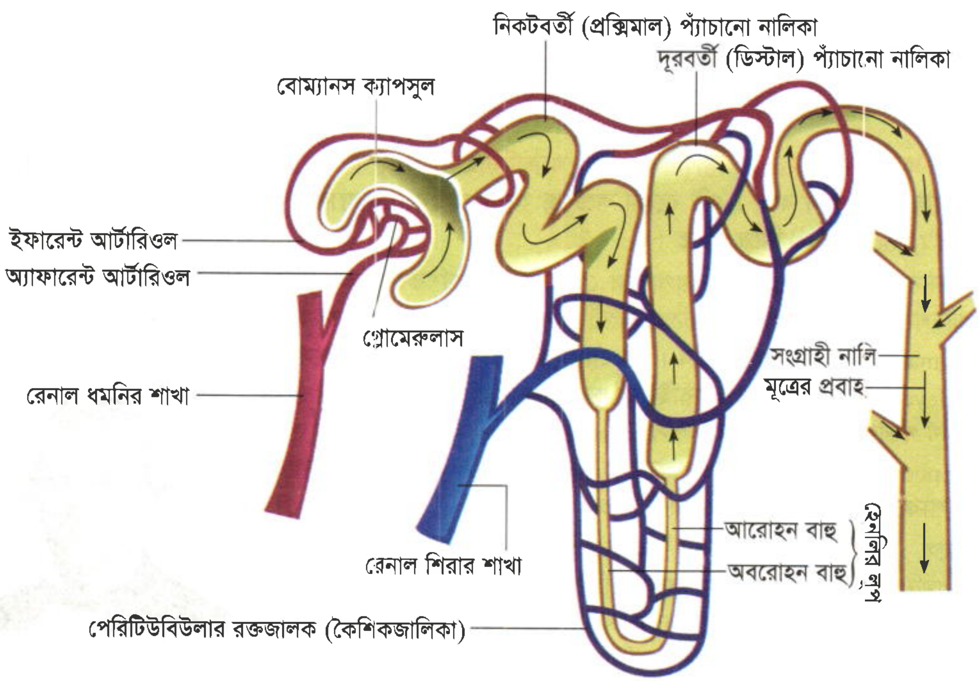


চিত্র ৬.৫ : একটি নেফ্রন (কৈশিকজালিকাসহ)

**iii. দূরবর্তী বা ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা (Distal convoluted tubule) :** হেনলির লুপ-এর পরবর্তী এ প্যাঁচানো নালিকা প্রায় ৫ মিলিমিটার লম্বা এবং এটি বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থান করে। এর শেষপ্রান্ত সংগ্রাহী নালির সাথে যুক্ত থাকে। এর প্রাচীর একস্তরী এপিথেলিয়াম কোষে গঠিত।

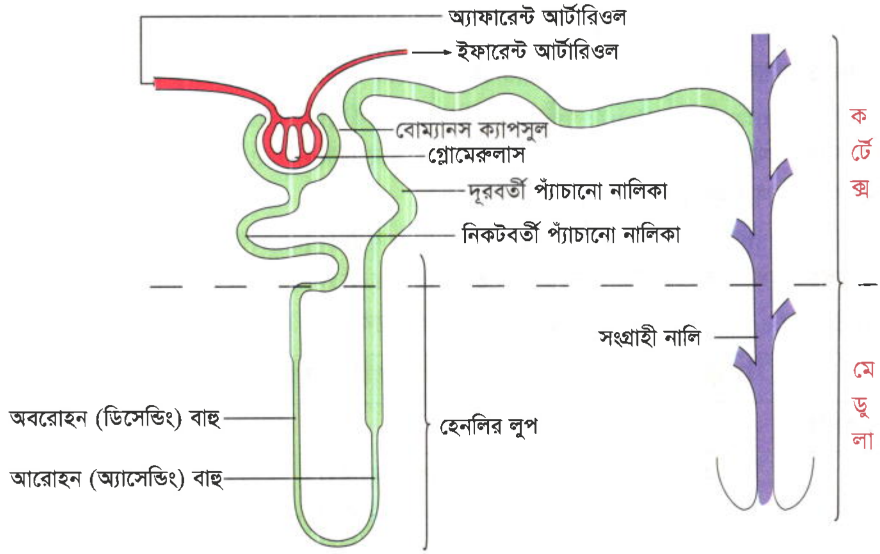

চিত্র ৬.৬ : একটি নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ (চিত্রানুগ)

রেনাল টিউবিউলের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা **সূক্ষ্ম কৈশিকজালিকা** বা **পেরিটিউবিউলার ক্যাপিলারি** (peritubular capillaries)-এ বেষ্টিত থাকে। এগুলো নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন বস্তু পুনঃশোষণ করে।

নেফ্রনের দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা যে সোজা নালির সাথে যুক্ত থাকে তাকে **সংগ্রাহী নালি** (collecting duct) বলে। একটি সংগ্রাহী নালিতে কয়েকটি নেফ্রন যুক্ত থাকে। এর কিছু অংশ কর্টেক্সে ও কিছু অংশ মেডুলায় অবস্থান করে। এর প্রাচীর একস্তরী কোষে গঠিত। কয়েকটি সংগ্রাহী নালি মিলিত হয়ে **ডাক্ট অব বেলিনি** (duct of Bellini) গঠন করে।

**কাজ:** রেনাল টিউবিউলের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী নালিকা **সূক্ষ্ম কৈশিকজালিকা** বা **পেরিটিউবিউলার ক্যাপিলারি** দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। এগুলো নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন বস্তু পুনঃশোষণ করে। নেফ্রনের নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকায় **নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ** (selective reabsorption) ঘটে। এর **হেনলির লুপ** থেকে পানি এবং দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা থেকে সামান্য পানি ও অন্যান্য বস্তু পুনঃশোষিত হয়।

**নেফ্রনের প্রকারভেদ :** অবস্থান অনুসারে নেফ্রন প্রধানত দুধরনের হয়। যথা–

১. **সুপারফিসিয়াল বা কর্টিক্যাল নেফ্রন (Superficial or Cortical Nephron) :** এসব নেফ্রন বৃক্কের কর্টেক্সের পরিধির দিকে অবস্থিত। ৮৫% নেফ্রন এ প্রকৃতির। এগুলো আকারে ছোট হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এগুলো মূত্র উৎপাদন করে।

২. **জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন (Juxtamedullary Nephron) :** বাকি ১৫% নেফ্রন কর্টেক্সের ভিতরের দিকে এবং মেডুলার বাইরের দিকে অবস্থান করে। এগুলো অপেক্ষাকৃত বড় আকারের হয়। এগুলো জরুরি অবস্থায় মূত্র উৎপাদন করে।

| কর্টিক্যাল নেফ্রন | জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন |
|---|---|
| ১. মোট নেফ্রনের ৮৫% এ ধরনের নেফ্রন। | ১. মোট নেফ্রনের ১৫% এ ধরনের নেফ্রন। |
| ২. কর্টেক্সের বাইরের দিকে গ্লোমেরুলাস অবস্থান করে। | ২. কর্টেক্সের অন্তঃপরিধি অঞ্চলে এদের গ্লোমেরুলাস অবস্থান করে। |
| ৩. আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। | ৩. আকারে বেশ বড়। |
| ৪. হেনলির লুপ ছোট এবং কর্টেক্সের ঠিক নিচে অবস্থান করে। | ৪. হেনলির লুপ যথেষ্ট লম্বা এবং মেডুলাতে অবস্থান করে। |
| ৫. পানির সরবরাহ যখন স্বাভাবিক থাকে তখন প্লাজমার ভলিউমকে নিয়ন্ত্রণ করে। | ৫. পানির সরবরাহ যখন কম থাকে তখন প্লাজমার ভলিউমকে নিয়ন্ত্রণ করে। |

## নেফ্রনের কাজ Reading

১. **পরিস্রুতকরণ (Filtration) :** নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস রক্তের প্রোটিন ছাড়া প্রায় সব উপাদান ছাঁকনির মাধ্যমে পৃথক করে বোম্যান্স ক্যাপসুলের গহ্বরে প্রেরণ করে।

২. **পুনঃশোষণ (Re-absorption) :** বৃক্কীয় নালিকার পরিস্রুত তরলের প্রয়োজনীয় পদার্থগুলো, যথা– গ্লুকোজ, অধিকাংশ লবণ ও প্রয়োজনীয় পানি প্রভৃতি পুনরায় শোষিত হয়ে রক্তনালিতে প্রবেশ করে।

৩. **নালিকার ক্ষরণ (Tubular Secretion) :** বৃক্কীয় নালিকা যে কেবল পুনঃশোষণের কাজ করে তাই নয়, এটি কয়েক ধরনের দূষিত পদার্থ যথা- নানা ধরনের সালফারঘটিত যৌগ, ক্রিয়েটিনিন এবং কয়েক ধরনের জৈব এসিড ইত্যাদি রক্তস্রোত থেকে নালিকা গহ্বরে ক্ষরণ করে।

৪. **নতুন পদার্থ সৃষ্টি (Manufacture of New Substances) :** বৃক্কীয় নালিকার এপিথেলিয় কোষে কয়েক প্রকার যৌগের যথা– অজৈব ফসফেট, অ্যামোনিয়া, হিপপিউরিক এসিড ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে নালিকার গহ্বরে যুক্ত হয়।

৫. **pH মাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Balancing of pH) :** দেহস্থিত pH- এর সঠিক মাত্রা রক্ষা করে।

Reading

### নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ ও সংগ্রাহী নালির কাজের ছক

| নেফ্রনের অংশ | কাজ | ক্ষরিত বস্তুর নাম |
|---|---|---|
| ১. বোম্যানস ক্যাপসুল | এর ভিসেরাল স্তর আল্ট্রাফিল্ট্রেশন অঙ্গরূপে কাজ করে এবং পরিস্রুত তরল সংগ্রহ করে বৃক্ক নালিকাতে প্রেরণ করে | রক্তের ছাকনকৃত পরিস্রুত বস্তু। |
| ২. গ্লোমেরুলাস | আল্ট্রাফিল্ট্রেট হিসেবে কাজ করে | কোলয়েড অংশ ছাড়া রক্তের প্লাজমা। |
| ৩. বৃক্ক নালিকা<br>ক. নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা | সক্রিয় শোষণ | গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফসফেট, $K^+$, $Na^+$. |
| | নিষ্ক্রিয় শোষণ | পানি, $Cl^-$, $HCO_3^-$, $NaHCO_3$ ও ১০% ইউরিয়া ও ইউরিক এসিড। |
| | ক্ষরণ | ক্রিয়েটিনিন, হিপপিউরিক এসিড, রঞ্জক, পেনিসিলিনসহ ড্রাগস, $H^+$ ও $NH_4^+$. |
| খ. হেনলির লুপ | সক্রিয় শোষণ | $K^+$, $Na^+$, $Cl^-$, ইউরিয়া, $Ca^{++}$, $Mg^{++}$. |
| | নিষ্ক্রিয় শোষণ | পানি। |
| | ক্ষরণ | ইউরিয়া। |
| গ. দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা | শোষণ | পানি, $Na^+$. |
| | ক্ষরণ | $H^+$, $K^+$, $NH_4^+$, $Cl^-$. |
| সংগ্রাহী নালি | পুনঃশোষণ | $K^+$, $Na^+$, $Cl^-$, $H_2O$, ইউরিয়া। |
| | ক্ষরণ | $K^+$, $H^+$, $HCO_3^-$, $NH_4^+$. |

## রেচনের শারীরবৃত্ত (Physiology of Excretion)

আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে দেহে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ সৃষ্টি হয়। এসব বর্জ্য দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেহ থেকে নিষ্কাশন করা উচিত। মানুষের প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত রেচন বর্জ্য হলো– ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি। এর মধ্যে ইউরিয়ার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং এটি মূত্রের সাথে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। যকৃতে ইউরিয়া উৎপন্ন হয় এবং রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে বৃক্কে পৌঁছায়। বৃক্কে মূত্র তৈরি হয়। রেচনে এরূপ ইউরিয়ার আধিক্য থাকাকে **ইউরিওটেলিজম** (ureotelism) বলে। যেসব প্রাণীতে ইউরিওটেলিজম দেখা যায় তাদের **ইউরিওটেলিক প্রাণী** (ureotelic animal) বলে।

মানুষ ইউরিওটেলিক হওয়ার কারণে রেচনের শারীরবৃত্তকে তাই দুটি শিরোনামে আলোচনা করা হলো : **ক. ইউরিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া** এবং **খ. মূত্র তৈরির প্রক্রিয়া**। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো।

### ক. ইউরিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া (Process of Formation of Urea)

দেহে প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাকের মাধ্যমে প্রায় ২০ ধরনের অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়। অধিকাংশ অ্যামিনো এসিড দেহের গাঠনিক ও কার্যকর প্রোটিন যেমন-পেশি, হরমোন, এনজাইম ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কিছু অ্যামিনো এসিড অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে যায়। এসব অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড যকৃতে আসে। যকৃতে এসব অ্যামিনো এসিড **ডি অ্যামাইনেজ** এনজাইমের উপস্থিতিতে **ডিঅ্যামিনেশন** (deamination) প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে **কিটো এসিড** ও **অ্যামিন মূলক** ($-NH_2$) সৃষ্টি করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনের জন্য **ক্রেবস চক্র** (Kreb Cycle)-এ প্রবেশ করে। অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) হাইড্রোজেন আয়ন ($H^+$)-এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া ($NH_3$) সৃষ্টি করে। এসব অ্যামোনিয়া মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ক্ষতিকর এ বস্তুটি শর্করা বিপাকে সৃষ্ট শ্বসন গ্যাস $CO_2$-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে দেহে তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকর **ইউরিয়া** [$CO(NH_2)_2$] সৃষ্টি করে। এক অণু $CO_2$ দুই অণু $NH_3$ এর সাথে মিলিত হয়ে এক অণু **ইউরিয়া** গঠন করে। ইউরিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি যকৃতে সংঘটিত হয়। **হ্যানস ক্রেবস** (Hans Krebs) এবং **কার্ট হেনসেলিয়েট** (Kurt Henseleit) ১৯৩২ সালে ইউরিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন এবং তাঁদের মতে **অরনিথিন চক্র** (Ornithin cycle) বা **ইউরিয়া চক্র** (Urea cycle)-এর মাধ্যমে ইউরিয়া সৃষ্টি হয়।
[MAT 24-25, 17-18]
[DAT 19-20]

১. আমিষ খাদ্য $\xrightarrow{\text{এনজাইম}}$ অ্যামিনো এসিড

২. অ্যামিনো এসিড $\xrightarrow{\text{ডিঅ্যামিনেশন}}$ কিটো এসিড + $-NH_2$

৩. $-NH_2 + H^+ \longrightarrow NH_3$ (অ্যামোনিয়া)

৪. $2NH_3 + CO_2 \xrightarrow{\text{অরনিথিন চক্র}} CO(NH_2)_2$ (ইউরিয়া) + $H_2O$

**অরনিথিন চক্র কী ?** যে চক্রাকার প্রক্রিয়ায় যকৃতকোষে অবস্থিত অ্যামোনিয়াকে ইউরিয়াতে পরিণত করা হয় তাকে **অরনিথিন চক্র** বলে। পাঁচটি ধারাবাহিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে চক্রটি সম্পন্ন হয়। প্রথম দুটি বিক্রিয়া যকৃত কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ার মাতৃকায় এবং অন্যগুলো যকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়। এ চক্রের প্রতি আবর্তে এক অণু ইউরিয়া সৃষ্টির পাশাপাশি এক অণু অরনিথিন উৎপন্ন হয় যা পুনরায় চক্রের সূচনা ঘটায়। চিত্রে অরনিথিন চক্রের ধাপগুলো দেখানো হলো–

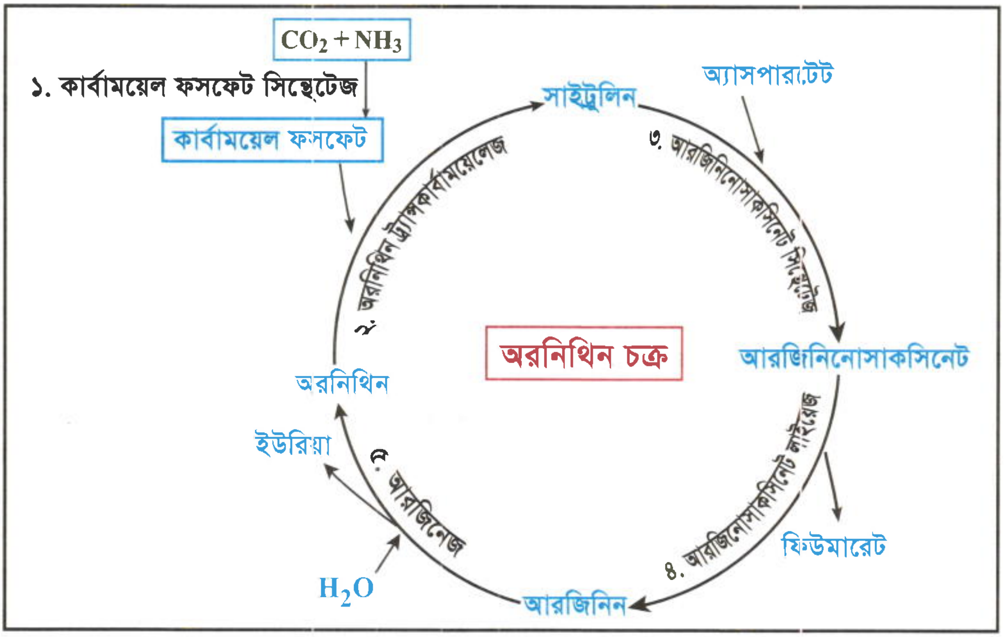


## খ. মূত্র তৈরির প্রক্রিয়া (Mechanism of Formation of Unine)

নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ রক্তের মাধ্যমে বৃক্কে আসার পর তিনটি ধাপে মূত্র সৃষ্টি হয়, যথা: (১) **অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ**, (২) **টিউবিউলার পুনঃশোষণ** এবং (৩) **সক্রিয় ক্ষরণ**। নিচে ধাপগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

**১. অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ বা আল্ট্রাফিলট্রেশন (Ultrafiltration) বা গ্লোমেরুলার ছাঁকন (Glomerular Filtration) :** মূত্র তৈরির প্রথম ধাপ হচ্ছে রক্তের **অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ**। নেফ্রনের রেনাল করপাসল বা মালপিজিয়ান বডিতে যে প্রক্রিয়ায় রক্ত থেকে পানি, রেচন বর্জ্য ও অন্যান্য পদার্থ পরিস্রুত হয় তাকে **অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ** বা **আল্ট্রাফিলট্রেশন** বলে। রেনাল করপাসল এর গ্লোমেরুলাস আল্ট্রাফিল্টার বা অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ যন্ত্রের কাজ করে। এ অংশে যে অতিসূক্ষ্ম ছাঁকন বা পরিস্রাবণ সংঘটিত হয় তা সাধারণ পরিস্রাবণ থেকে আলাদা। এক্ষেত্রে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়াটি চাপ প্রয়োগের ফলে সংঘটিত হয় বলে একে **আল্ট্রাফিলট্রেশন** বা **অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ** বলে।

অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড থেকে পৃষ্ঠীয় ধমনি, রেনাল ধমনি এবং অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলের মাধ্যমে রক্ত অতি উচ্চচাপে গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করে। সাধারণত অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলের তুলনায় ইফারেন্ট আর্টারিওলের ব্যাস সংকীর্ণ হওয়ায় গ্লোমেরুলাসে রক্তের উচ্চচাপ সৃষ্টি হয়। এ **হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ** (hydrostatic pressure)-এ রক্তের প্রোটিন ও রক্তকণিকা ছাড়া সমস্ত পানি, লবণ, শর্করা, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড প্রভৃতি কৈশিকজালিকার এন্ডোথেলিয়াম ও ভিত্তিঝিল্লি এবং রেনাল ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম ভেদ করে **ক্যাপসুলার স্পেস** (capsular space)-এ জমা হয়। এ পরিস্রুত তরলকে **গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট** (glomerular filtrate) বলে। পরিস্রাবণের জন্য গ্লোমেরুলাসের কৈশিকজালিকার প্রাচীর ও বোম্যানস ক্যাপসুলের প্রাচীর মিলে তিন স্তরবিশিষ্ট একটি ফিল্টার বা ছাঁকনি গঠন করে। এ ছাঁকনিতে উপস্থিত বিভিন্ন ব্যাসের ছিদ্রপথে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট পরিস্রুত হয়। বোম্যানস ক্যাপসুলের অন্তঃস্তর বা এন্ডোথেলিয়ামে বিদ্যমান **পোডোসাইট কোষ** (podocyte cell) গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট পরিস্রাবণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

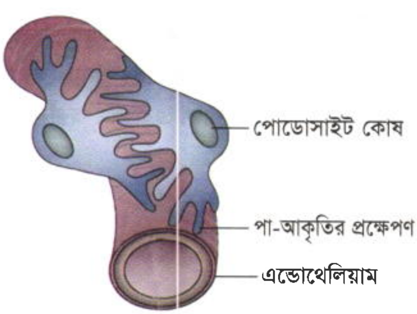

চিত্র ৬.৮ : নেফ্রনের ছাঁকন যন্ত্র

মানবদেহের দুটি বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে প্রায় [MAT 24-25] ১২০০ ml (১০০০−১৩০০ml )রক্ত প্রবাহিত হয়। এ রক্ত থেকে প্রায় 125 ml গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট (পরিস্রুত) উৎপন্ন হয়ে বোম্যানস ক্যাপসুল-এ জমা হয়। অন্যদিকে, পরিস্রুত রক্ত পরে ইফারেন্ট আর্টারিওলে প্রবেশ করে। যে চাপের মাধ্যমে রক্তের দ্রাব্যবস্তু পরিস্রুত হয়, তাকে **কার্যকর পরিস্রাবণ চাপ** (effective filtration pressure) বলে। হিসেবে দেখা গেছে, কার্যকর পরিস্রাবণ চাপ প্রায় ১০ mmHg। এ চাপের প্রভাবে প্রতি মিনিটে প্রায় ১২৫ ml রক্তরস গ্লোমেরুলাস থেকে পরিস্রুত হয়। তবে এ হার পরিস্রাবণ চাপের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

**২. টিউবিউলার পুনঃশোষণ (Tubular Reabsorption) বা নির্বাচিত পুনঃশোষণ (Selective Reabsorption):** বোম্যানস ক্যাপসুল থেকে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট বৃক্ক নালিকা বা রেনাল টিউবিউলে প্রবেশ করে। এখানে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের ৮০% নির্বাচিত পদার্থ পুনঃশোষিত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে। টিউবিউলের প্রাচীরের কোষগুলো পুনঃশোষণের জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত। যেমন- (i) কোষগুলোর একপাশে মাইক্রোভিলাই ও বেসাল চ্যানেল থাকায় এদের শোষণতল বেশি; (ii) সাইটোপ্লাজমে বেশি সংখ্যক মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে; এবং (iii) রক্তের কৈশিকজালিকার সাথে ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে।

রেনাল টিউবিউলসের বিভিন্ন অংশে যেসব পদার্থের পুনঃশোষণ হয় তা হচ্ছে −

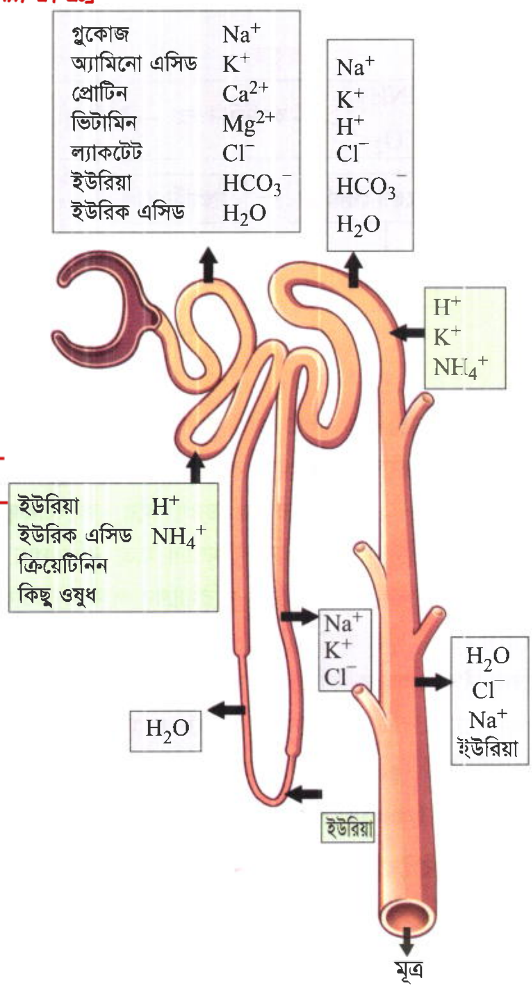


চিত্র ৬.৯ : নেফ্রনে মূত্র তৈরির কৌশল

i. **প্রক্সিমাল বা নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা :** এখানে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের ৬০% পুনঃশোষিত হয়। গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ভিটামিন, হরমোন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড, ফসফেট, বাইকার্বোনেট, পানি, কিছু ইউরিয়া ইত্যাদি এ অংশে পুনঃশোষিত হয়।

ii. **হেনলির লুপ :** এখানে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি পুনঃশোষিত হয়।

iii. **ডিস্টাল বা দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা:** এখানে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন আয়ন ইত্যাদি পুনঃশোষিত হয়। অন্যদিকে ADH (অ্যান্টি ডাইইউরেটিক হরমোন) পানি পুনঃশোষণে সাহায্য করে।

iv. **সংগ্রাহী নালি :** এখানে প্রধানত পানি এবং অল্প পরিমাণ $Cl^-$, $Na^+$ ও ইউরিয়া পুনঃশোষিত হয়।

**৩. টিউবিউলার ক্ষরণ বা সক্রিয় ক্ষরণ (Active Secretion) :** বিপাক ক্রিয়ায় সৃষ্ট কিছু অপ্রয়োজনীয় উপজাত পদার্থ, যথা−ক্রিয়েটিনিন ও কিছু ইউরিয়া নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকার চারপাশে রক্তজালক থেকে সক্রিয় ক্ষরণের মাধ্যমে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের সাথে যুক্ত হয়। দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকায় হাইড্রোজেন আয়ন, পটাসিয়াম ও অ্যামোনিয়াম আয়ন, সেরোটোনিন, কোলিন, হিস্টামিন ইত্যাদি ক্ষরিত হয়ে ফিলট্রেটের সাথে মিশে **মূত্রে** (urine) পরিণত হয়। উৎপন্ন মূত্র অতঃপর সংগ্রাহী নালিকা, ইউরেটার হয়ে মূত্রথলি এবং মূত্রথলি থেকে মূত্রনালির মাধ্যমে বাইরে নিষ্কাশিত হয়।

মূত্র বা নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশনের গতিপথ নিচে দেখানো হলো :

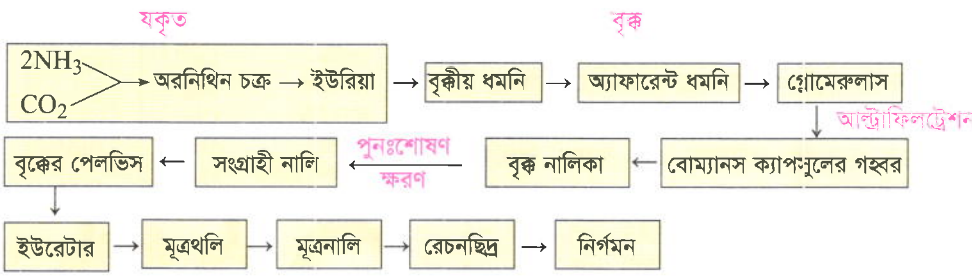


## মূত্র (Urine)

**নেফ্রনের রেনাল টিউবিউলসে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের নির্বাচিত পুনঃশোষণের পর যে খড় বর্ণের, তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ও অম্লধর্মী তরল রেচন বর্জ্য মূত্রথলিতে জমা হয় তাকে মূত্র বলে।** একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক গড়ে ১.৫ (০.৮ – ২.০) লিটার মূত্র ত্যাগ করে। তবে কিছু কারণে এ পরিমাণ প্রভাবিত হয়ে থাকে। যেমন–খাদ্যে তরল পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকলে মূত্রের মাত্রা বৃদ্ধি পায় ও শরীরে ঘাম বেশি হলে মূত্রের পরিমাণ কমে যায়। খাদ্যের প্রকৃতিও অনেক সময় মূত্রের পরিমাণের পার্থক্য ঘটায়। লবণাক্ত খাবার সাধারণত মূত্রের পরিমাণ বাড়ায়। বহুমূত্র (diabetes), বৃক্ক প্রদাহ (nephritis) প্রভৃতি রোগ প্রস্রাবের হার ও মাত্রা উভয়কে প্রভাবিত করে। কিছু দ্রব্য মূত্রের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাড়িয়ে দেয়। এসব দ্রব্য **ডাইইউরেটিকস** (diuretics) বা **মূত্রবর্ধক** নামে পরিচিত। পানি, লবণাক্ত পানি, চা ও কফি এ ধরনের দ্রব্য। দেহে দৈনিক স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত মূত্র (> ২.৫ লিটার) উৎপাদিত হলে তাকে **পলিউরিয়া** (polyuria), মূত্রের পরিমাণ <৪০০ মি.লি. হলে **অলিগোরিয়া** (oliguria) এবং <১০০ মি.লি. হলে **অ্যানুরিয়া** (anuria) বলে।

### মূত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Urine)

মূত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো– [MAT 14-15, DAT 16-17]

১. **বর্ণ (Colour) :** স্বাভাবিক মূত্র হালকা হলুদ বা খড় বর্ণের (straw colour)। মূত্রে **ইউরোক্রোম** (urochrome) নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় মূত্রের রং হালকা হলুদ হয়।

২. **পরিমাণ (Volume) :** প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের মূত্রের পরিমাণ ৬০০–২৫০০ মিলিলিটার। পানি পানের মাত্রা, খাদ্যের ধরন, পরিবেশের তাপমাত্রা, মানসিক ও দৈহিক অবস্থায় ইত্যাদির ওপর মূত্রের উৎপাদন নির্ভর করে।

৩. **আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) :** মূত্রের স্বাভাবিক আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০০৮ – ১.০৩০।

৪. **বিক্রিয়া (Reaction) :** তাজা মূত্র স্বচ্ছ ও হালকা অম্লধর্মী। মূত্রের গড় pH মান হচ্ছে 6.0 (মাত্রা 4.5 - 8.0)।

৫. **গন্ধ (Odour) :** মূত্রের গন্ধ অনেকটা অ্যারোমেটিক (aromatic)। মূত্রে উদবায়ু জৈবপদার্থ থাকার জন্য এমন গন্ধ হয়। এছাড়া দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ **ইউরিনোড** ($C_6H_8O$) এর উপস্থিতির জন্য মূত্রে গন্ধ হয়। স্বাভাবিক মূত্রকে ফেলে রাখলে অ্যামোনিয়ার গন্ধ হয়। মূত্রের ইউরিয়া জীবাণুর সংস্পর্শে এসে অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত হয়।

### মূত্রের রাসায়নিক উপাদান (Chemical Composition of Urine)

মূত্রের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে ৯৫% (৯৫-৯৭%) পানি এবং ৫% (৩–৫%) কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে জৈব ও অজৈব উপাদান রয়েছে।

[MAT 12-13]

নিচে ছক আকারে জৈব (৬০%) ও অজৈব (৪০%) উপাদানগুলো দেখানো হলো।

| জৈব উপাদান | শতকরা হার | অজৈব উপাদান | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| ইউরিয়া | ২ | সোডিয়াম | ০.৩৫ |
| ইউরিক এসিড | ০.০৫ | পটাসিয়াম | ০.১৫ |
| হিপ্পিউরিক এসিড | ০.০৫ | ক্যালসিয়াম | ০.০৩ |
| ক্রিয়েটিনিন | ০.০৭ | অ্যামোনিয়াম | ০.০৪ |
| কিটোন বডিস | ০.০২ | ম্যাগনেসিয়াম | ০.০১ |
| ক্রিয়েটিন | ০.০১ | ক্লোরাইড | ০.৬০ |
| | | সালফেট | ০.১৮ |
| | | ফসফেট | ০.২৭ |

***
এছাড়াও মূত্রে আয়োডিন, সিসা, আর্সেনিকসহ অন্যান্য উপাদান পাওয়া যায়।

| মূত্রের অস্বাভাবিক কিছু উপাদান | | |
|---|---|---|
| **অস্বাভাবিক উপাদান** | **যে রোগে নির্গত হয়** | **উপাদানটির উপস্থিতিকে যা বলা হয়** |
| **১. গ্লুকোজ** | ডায়াবেটিস মেলিটাস | গ্লাইকোসুরিয়া (Glycosuria) |
| **২. প্রোটিন** | বৃক্কের প্রদাহ, লিউকেমিয়া, লিম্ফোসারকোমা প্রভৃতি | প্রোটিনিউরিয়া (Proteinuria) |
| **৩. লিপিড** | বৃক্কে রোগ, অ্যালকোহলের ক্রিয়া | লিপুরিয়া (Lipuria) |
| **৪. বিলিরুবিন** | জন্ডিস | বিলিরুবিনিউরিয়া (Bilirubinuria) |
| **৫. রক্ত** | বৃক্কে প্রদাহ, প্রস্টেট প্রদাহ, বৃক্কে আঘাত | হেমাচুরিয়া (Hematuria) |

**মূত্রত্যাগ (Micturition or Urination) :** মূত্রথলি থেকে মূত্রনালির মাধ্যমে দেহ থেকে মূত্র নিষ্কাশিত হওয়ার কৌশলকে **মূত্রত্যাগ** বলে। মানুষের মূত্রথলিতে ২৮০–৩২০ মিলিলিটার মূত্র জমা হলেই একটি চাপ সৃষ্টি হয়। চা, কফি, অ্যালকোহল ইত্যাদি পানীয় মূত্র সৃষ্টি ত্বরান্বিত করে। এজন্য এদের **ডাইইউরেটিক** বলা হয়। মূত্রনালির **ডেট্রুসর পেশির** (detrusor muscle) সংকোচন ও **স্ফিঙ্কটার পেশির** (sphincter muscle) প্রসারণ ঘটিয়ে মূত্র দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক ৬-৮ বার মূত্র ত্যাগ করে।

## রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা

কোষ থেকে নাইট্রোজেনঘটিত বিপাকীয় বর্জ্যের অপসারণের আরেক নাম **রেচন**। বিপাকীয় বর্জ্য দেহের জন্য অপ্রয়োজনীয়। দেহকোষ, টিস্যু ও অঙ্গে যে অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তার ফলে দেহের জন্য ক্ষতিকর যেসব বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় তা রেচনে এবং দেহের অসমোরেগুলেশনে (রক্তে পানি ও আয়নসাম্য রক্ষা) বৃক্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো।

### রেচনে বৃক্কের ভূমিকা (Role of Kidney in Excretion)

বৃক্ক প্রধানত নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশন করে। আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে দেহে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য সৃষ্টি হয়। অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি মানুষের প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য। এদের **রেচন বর্জ্য** বলে। এগুলো রক্তের মাধ্যমে সারাদেহে প্রবাহিত হয়। এগুলো বিষাক্ত ও দেহের জন্য ক্ষতিকর। তাই এসব রেচন পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশন করা অত্যাবশ্যক। বৃক্ক এসব রেচন পদার্থ দেহ থেকে অপসারণ করে দেহকে সুস্থ রাখে। নিম্নলিখিত উপায়ে বৃক্ক এসব বর্জ্য নিষ্কাশন করে।

**১. ইউরিয়া বর্জ্য :** আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়। অ্যামিনো এসিড প্রধানত দেহ গঠন ও বৃদ্ধির কাজ করে থাকে। অ্যামিনো এসিডের বৈশিষ্ট্য হলো দেহে যতটুকু অ্যামিনো এসিড প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই ব্যবহৃত হতে পারে, অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড দেহে জমা থাকতে পারে না।

অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড যকৃতে **ডি-অ্যামাইনেজ** এনজাইমের উপস্থিতিতে **ডি-অ্যামিনেশন** (deamination) প্রক্রিয়ায় কিটো এসিড ও অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) সৃষ্টি করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) হাইড্রোজেন আয়ন ($H^+$) এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া ($NH_3$) সৃষ্টি করে। অ্যামোনিয়া ($NH_3$) অত্যন্ত বিষাক্ত। এটি $CO_2$ এর সাথে যুক্ত হয়ে যকৃতে **অরনিথিন চক্রের** মাধ্যমে কম ক্ষতিকর ও পানিতে দ্রবণীয় **ইউরিয়াতে** পরিণত হয়। ইউরিয়া রক্তের প্লাজমায় (রক্তরসে) অবস্থান করে এবং সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছে। এরপর মূত্র সৃষ্টির মাধ্যমে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

**২. ইউরিক এসিড বর্জ্য :** প্রধানত যকৃতের কোষে ও স্বল্প পরিমাণে বৃক্কের কোষে নিউক্লিক এসিডের **পিউরিন ক্ষারক বা বেস** (base)-এর বিপাকের ফলে **ইউরিক এসিড** উৎপন্ন হয়। পিউরিন বেস দুধরনের, যথা–**অ্যাডেনিন** ও **গুয়ানিন**। অ্যাডেনিন ও গুয়ানিন **হাইড্রোলাইটিক ডিঅ্যামিনেশন** প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে **হাইপোজ্যান্থিন** ও **জ্যান্থিন** উৎপন্ন করে। এ হাইপোজ্যান্থিন ও জ্যান্থিন জারিত হয়ে ইউরিক এসিডে পরিণত হয় এবং রক্ত সংবহনের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছায়।

অ্যাডেনিন → (হাইড্রোলাইটিক ডিঅ্যামিনেশন) → হাইপোজ্যান্থিন —জারন→ জ্যান্থিন —জারন→ **ইউরিক এসিড**

গুয়ানিন → (হাইড্রোলাইটিক ডিঅ্যামিনেশন) → জ্যান্থিন

**হাইপারইউরিকোসরিয়া** (hyperuricosuria; মূত্রে অতিমাত্রার ইউরিক এসিড) রোগীদের ক্ষেত্রে মূত্রের ইউরিক এসিড বৃক্ক, রেচননালি কিংবা মূত্রথলিতে সঞ্চিত হয়ে সুঁই আকৃতির (needle shaped) স্ফটিক সৃষ্টি করে যা **বৃক্কের পাথর** (kidney stone) নামে চিহ্নিত। তবে বৃক্কের পাথর অন্যান্য পদার্থ জমা হয়েও সৃষ্টি হতে পারে।

**৩. ক্রিয়েটিনিন বর্জ্য :** ক্রিয়েটিনিন একটি অ্যানহাইড্রাইড জাতীয় জটিল বর্জ্য পদার্থ। পেশি প্রোটিনের ভাঙ্গনে উৎপন্ন গ্লাইসিন, আর্জিনিন ও মেথিওনিন নামক তিনটি অ্যামিনো এসিড **ট্রান্সঅ্যামিনেশন** বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমে **ক্রিয়েটিন** (creatine) নামক একটি নন-প্রোটিন অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়। ক্রিয়েটিন পরে **ডিহাইড্রেশন** বিক্রিয়ার মাধ্যমে **ক্রিয়েটিনিন** (creatinin)-এ রূপান্তরিত হয় ও রক্ত সংবহনের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছায়।

গ্লাইসিন, আর্জিনিন, মেথিওনিন —ট্রান্সঅ্যামিনেশন→ ক্রিয়েটিন —($-H_2O$)→ **ক্রিয়েটিনিন**

বৃক্কে রক্ত থেকে ক্রিয়েটিনিন পরিস্রুত হয়ে মূত্রের সাথে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা দিয়ে বৃক্কের সুস্থ্যতা নির্ণয় করা হয়। তাই রক্তের ক্রিয়েটিনিন মাত্রাকে **বৃক্কের রোগ নির্ণয়ের নির্দেশক** (diagnostic index of kidney) হিসেবে গণ্য করা হয়। রক্তে ক্রিয়েটিনিন স্বাভাবিক মাত্রা পুরুষের 0.6 - 1.2 mg/dl এবং মহিলাদের 0.5 - 1.1 mg/dl.

**৪. অন্যান্য বর্জ্য :** বৃক্ক থেকে বিভিন্ন বিষ, অতিরিক্ত ওষুধ ও হরমোন বহিষ্কৃত হয়। বৃক্কের মাধ্যমে রক্ত থেকে অতিরিক্ত চিনি ও অ্যামিনো এসিড অপসারিত হয়।

## অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা (Role of Kidney in Osmoregulation)

**অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়া বলতে জীবন্ত কোষ বা দেহের অন্তঃ ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে অভিস্রবণিক চাপের সমতা রক্ষাকে বুঝায়।** বৃক্ক দেহের **অভ্যন্তরীণ পরিবেশের স্থিতি বজায় রাখতে** (homeostasis) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহের পানি ও সোডিয়াম, পটাসিয়াম লবণ এবং ক্লোরাইড আয়নের মধ্যে একটি আন্তরসাম্য রক্ষা প্রক্রিয়াকে **অসমোরেগুলেশন** বলা হয়। দেহে অন্তঃঅভিস্রবণিক চাপের সমতা বিধান দেহের জন্য অপরিহার্য। এতে

করে দেহ তরল (body fluid) খুব ঘনও হয় না আবার খুব হালকাও হয় না। দেহের মধ্যস্থ তরল পদার্থ ও দ্রবীভূত লবণসমূহের ঘনত্বের উপর অভিস্রবণ প্রক্রিয়া নির্ভর করে। কোষের অভ্যন্তরের তরল পদার্থ এবং কোষের বাইরে, যেমন-রক্তের প্লাজমা অংশ, টিস্যুরস ও লিম্ফ ইত্যাদি তরল পদার্থের গঠন একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

দেহে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পানি ও লবণের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যেমন, শ্বসনের মাধ্যমে কিছু পানি হারিয়ে যায়, ঘাম নিঃসরণের মধ্য দিয়ে শরীর থেকে কিছু পরিমাণ পানি নিষ্কাশিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেহ তরলের অভিস্রবণিক চাপের তেমন তারতম্য ঘটে না। কারণ বৃক্ক অভিস্রবণিক চাপকে তেমন বাড়তে বা কমতে দেয় না। মূত্রের সঠিক পরিমাণকে বজায় রেখে বৃক্ক দেহ তরলের পরিমাণ ও অভিস্রবণিক চাপকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন– খুব বেশি পরিমাণ পানি এক সঙ্গে পান করা হলে ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণ মূত্র ত্যাগ হয়। এরপর মূত্রের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে আসবে। বৃক্ক জানে কি পরিমাণ অতিরিক্ত পানি গ্রহণ করা হয়েছিল, আর প্রায় সেই পরিমাণ পানি শরীর থেকে নিষ্কাশিত করতে হবে।

**অসমোরেগুলেশন পদ্ধতি :** দেহে পানির সমতা রক্ষা করার জন্যে **অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন** (Antidiuretic Hormone, ADH) নামক একটি হরমোন রয়েছে। ADH-কে **ভ্যাসোপ্রেসিন** (vasopressin)-ও বলা হয়। দেহের পানির পরিমাণ কম হলে রক্তে ADH এর পরিমাণ বেড়ে যায়, ফলে বৃক্ক অল্প পরিমাণ (মিনিটে ০.৩-০.৫ মিলিলিটার) মূত্র উৎপন্ন করে এবং দেহের পানির পরিমাণ ঠিক রাখে। অন্যদিকে কোন কারণে পানির আধিক্য দেখা দিলে রক্তে ADH অতিমাত্রায় কমে যায় এবং দেহের পানির পরিমাণ বেড়ে যায় কারণ বৃক্কে তখন পানি শোষণের ক্ষমতা কমে যায়। এ অবস্থায় মূত্রের পরিমাণ প্রতি মিনিটে ১৬ মিলিলিটার পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। মস্তিষ্কের গোড়ায় **হাইপোথ্যালামাস** অংশে কিছু স্নায়ুকোষ এ ADH ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এখান থেকে **নিউরোসিক্রেশন** (neurosecretion) প্রক্রিয়ায় নিঃসৃত ADH পশ্চাৎপিটুইটারি গ্রন্থির মধ্যে পরিবাহিত হয় এবং রক্তে অবমুক্ত হয়। হাইপোথ্যালামাসের মধ্যে উপস্থিত-**অসমোরিসেপ্টর** (osmoreceptor) নামক স্নায়ুকোষ দেহ তরলের অভিস্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

### সোডিয়াম আয়ন সমতা রক্ষা

$Na^+$ দেহতরলে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটি দেহের বহিঃকোষীয় তরলের আয়তন ঠিক রাখে। বহিঃকোষীয় তরলে $Na^+$ আয়নের ঘনত্ব থাকে প্রায় 135-145 mmol/L এবং অন্তঃকোষীয় তরলে 5-15 mmol/L। সুস্থ স্বাভাবিক দেহে এ ঘনমাত্রা সবসময় ধ্রুব থাকে। সাধারণ খাদ্য, খাবার লবণ ও পানীয়ের সাথে দেহে চাহিদার বেশি $Na^+$ প্রবেশ করে থাকে। মূত্র, ঘাম এবং মলের সাথে অতিরিক্ত $Na^+$ দেহ হতে বের হয়ে যায়।

### পটাসিয়াম আয়ন সমতা রক্ষা

$K^+$ এর অভাবে পেশির দুর্বলতা ও ব্যাথা দেখা দেয়। এর কম বা বেশি উপস্থিতি হৃৎপিণ্ডে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এর ঘনত্ব বহিঃকোষীয় তরলে 3.5-5.0 mmol/L এবং অন্তঃকোষীয় তরলে 120-150 mmol/L. প্রয়োজনের অতিরিক্ত $K^+$ মূত্র ও মলের সাথে দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

### বৃক্ক ভালো রাখতে কী করা উচিত ?

১. বৃক্ক ভালো রাখতে সবাইকে পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। এই পানি অবশ্যই হতে হবে জীবাণু মুক্ত, নিরাপদ। অসুস্থতায় (জ্বর, ডায়রিয়া, বমি প্রভৃতি) এবং ব্যায়ামের পর পানির চাহিদা বাড়ে। বিশেষত ডায়রিয়া বা বমি হলে পর্যাপ্ত পানি, স্যালাইন এবং তরল খাবার খেতে হবে অবশ্যই। গর্ভবর্তী এবং স্তন্যদায়ী মায়ের জন্য পানির চাহিদা বেশি। আবহাওয়ার পরিবর্তনে পানির চাহিদা কমবেশি হতে পারে।

২. ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

৩. সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৪. রোজ অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করতে হবে (রোজ না পারলেও সপ্তাহের অধিকাংশ দিন)। হাঁটা, দৌড়ানো, সাইকেল চালানো, ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম উপকারী।

৫. ধূমপান, পান-জর্দা, অ্যালকোহল বর্জনীয়। ধূমপায়ীর কিডনিতে রক্তসঞ্চালন ও কর্মক্ষমতা কমে যায়। ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়ে।

৬. প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুম ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

৭. চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবন না করাই ভালো। বিশেষ ব্যথানাশক সেবন করে একেবারেই উচিত নয়।

## বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয় (Acute Renal Failure, Symptoms and Measures)

বয়স বাড়ার সাথে সাথে বৃক্কের কাজকর্মেও (বিশেষ করে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায়) পরিবর্তন ঘটে, সক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসে। বলা হয়ে থাকে, ৭০ বছর বয়স্ক মানুষের বৃক্ক ৫০-৭০% কাজে সক্ষম থাকে। রোগ-ব্যাধির কারণে বৃক্কের সক্ষমতা কমে যাওয়াকে **বৃক্ক বিকল** (kidney failure) বলে। বৃক্কের বৈকল্য দুভাবে দেখা দিতে পারে, একটি হচ্ছে **দীর্ঘস্থায়ী** (chronic), অন্যটি **তাৎক্ষণিক** (acute)।

১. বৃক্কের দীর্ঘস্থায়ী বিকল বা ক্রনিক রেনাল ফেইলুর (Chronic Renal Failure) : বৃক্ক যখন নিজস্ব কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে এর কার্যকারিতা ৩ মাস বা এর বেশি সময় পর্যন্ত লোপ পেয়ে থাকে তখন তাকে **বৃক্কের দীর্ঘস্থায়ী বিকল** বলে। এ ধরনের রোগীদের সাধারণত তেমন কোন উপসর্গ পরিলক্ষিত হয় না। ফলে বছরের পর বছর এরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় না। যখন উপসর্গ দেখা দেয় তখন তাদের বৃক্কের কার্যকারিতা ৭০--৭৫% লোপ পায়। এসব রোগীদের ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করে পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কেবল **ডায়ালাইসিস** অথবা **বৃক্ক প্রতিস্থাপনই** এসব রোগীদের একমাত্র চিকিৎসা।

২. বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল বা অ্যাকিউট রেনাল ফেইলুর (Acute Renal Failure) : মাত্র কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের মধ্যে যখন বৃক্ক দেহের বর্জ্যপদার্থ অপসারণ, পানিসাম্য ও ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন এ অবস্থাকে **বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল** বলে। এ ধরনের বিকলের ফলে প্রস্রাবের মাত্রা কমে যায় বা প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এ রোগ হলে রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। ডায়ালাইসিস অথবা অন্যান্য চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। কারণ এর ফলে দেহে যে পটাসিয়াম আয়ন উৎপন্ন হয় তা অপসারিত হয় না ফলে রক্তে $K^+$ এর পরিমাণ বেড়ে যায় যা হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে দিতে পারে।

যেহেতু মানবদেহে **দুটি বৃক্ক** থাকে তাই একটি বৃক্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যটি যদি সুস্থ থাকে তাহলে সুস্থ বৃক্কই দুটি বৃক্কের কাজ সম্পন্ন করে।

এ উপঅধ্যায়ে সিলেবাসভুক্ত বৃক্কের শুধু তাৎক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

### বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের কারণ

সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় ৭০% বৃক্ক বিকলের জন্য দায়ী ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ। তবে বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের অন্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. বৃক্কে রক্তপ্রবাহ হ্রাস (Reduced blood flow to kidneys) : ডায়রিয়া, রক্তক্ষরণ, যেমন– রক্তবমি, সার্জিক্যাল অপারেশন, গর্ভপাত, শক, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর, রক্তে পানি ও লবণ জাতীয় পদার্থের অভাব, ভুল রক্ত দেয়া, যকৃত বৈকল্য, তীব্র অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া, তীব্র সংক্রমণ, তীব্র পানিশূন্যতা, মারাত্মকভাবে পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে রক্তের প্রবাহ হ্রাস পায়। ফলে বৃক্ক পর্যাপ্ত মূত্র তৈরি করতে পারে না।

২. ক্ষতিগ্রস্ত বৃক্ক (Damage to kidneys) : হঠাৎ বৃক্ক প্রদাহ, ওষুধের বিষক্রিয়া (বিশেষত ব্যথানাশক ওষুধ; এছাড়াও বৃক্কে সংক্রমণের কারণ হিসেবে ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ, ভাইরাস, হেপাটাইটিস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াকে দায়ী করা হয়), সর্প দংশন, বৃক্ক সংক্রমণ, বৃক্কীয় রক্তনালির প্রদাহ, হিমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোম, বৃক্কীয় নালিতে রক্ত জমাট বাঁধা ইত্যাদি কারণে বৃক্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ফলে বৃক্ক পর্যাপ্ত মূত্র তৈরি করতে পারে না।

**৩. মূত্র নিঃসরণে বাধাগ্রস্ততা (Urine blockage in kidneys) :** মূত্রনালির বাধাগ্রস্ততা, বৃক্ক ও মূত্রনালিতে পাথর, টিউমার, পুরুষের প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি, মূত্রনালিতে ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সার, সার্ভিক্স ক্যান্সার হওয়া ইত্যাদি কারণে মূত্র নিঃসরণ বাধাগ্রস্ত হয়। বৃক্ক মূত্র উৎপাদনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মূত্র বৃক্ক থেকে মূত্রথলিতে পৌঁছাতে পারে না।

জন্মগত কারণেও কারও বৃক্কের কার্যকারিতা কম হতে পারে। খাবারে রাসায়নিক পদার্থ মিশানো, পানিতে অধিক হারে আর্সেনিক, বৃক্কের রোগের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

### বৃক্ক বিকলের লক্ষণ

**তাৎক্ষণিক বৃক্ক বিকলের লক্ষণগুলো হচ্ছে–**

১. অতি অল্প, ঘন ও গাঢ় মূত্র ত্যাগ বা মূত্র একেবারেই না হওয়া।

২. রক্তে নাইট্রোজেনজাত বর্জ্যপদার্থ জমা হওয়া।

৩. রক্তে তরলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় হাত ও পায়ের পাতা, পা, গোড়ালি, মুখমণ্ডল প্রভৃতি ফুলে যায়, ফুসফুসে পানি জমার কারণে ঘনঘন শ্বাস নিতে হয়।

৪. পাঁজর ও কোমরের মাঝামাঝি দুপাশে ব্যথা (flank pain)।

৫. ক্ষুধামান্দ্য, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৬. রক্তে পটাসিয়ামের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় পেশির অসারতা ও অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন হয়।

৭. রক্তে ফসফেটের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় চুলকানি, অস্থিরতা, পেশির খিঁচুনি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

৮. উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্ত-মূত্র (haematuria)।

৯. প্রচুর পানি খেলেও মূত্রত্যাগ হয় না বা মূত্র মূত্রথলিতে জমা হয় না।

১০. খাবারের অরুচি, তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, অসংলগ্ন কথা বলা, অনেকক্ষণ ধরে হেচকি তোলা, মুখে ধাতব স্বাদ অনুভূত হওয়া।

### বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলে করণীয় (চিকিৎসা ও প্রতিকার)

বৃক্ক বিকল অত্যন্ত জটিল রোগ। তাৎক্ষণিক বৃক্ক বিকল আরও জটিল বিষয়। তাই এ রোগের প্রতিকার করতে হলে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। লক্ষণের দু-একটি বৈশিষ্ট্য দেখেই খাদ্য ও পথ্য বিষয়ে নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ জীবনের জন্যে মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। শুধু তাই নয়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে এ রোগের চিকিৎসার আরেক অর্থ হচ্ছে "অর্থ দিয়ে অনর্থ" ডেকে আনা।

বৃক্ক বিকলের প্রতিকারে বিশেষজ্ঞরা নিচে বর্ণিত পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন–

১. বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলতার বিষয়টি বুঝতে পারা মাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা।

২. প্রাপ্তবয়স্ক লোকের রক্তচাপ নিয়মিত পরিমাপ করা উচিত। রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন আছে কিনা, ডায়াবেটিসের অবস্থা জানার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এজন্য আল্ট্রাসনোগ্রাফি, আই ভি ইউ, রেনোগ্রাম ইত্যাদি পরীক্ষা করতে হবে।

৩. পরিসংখ্যানে দেখা যায় ৪৪% কিডনি রোগীই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। আবার উচ্চ রক্তচাপের কারণে ২০-৪০% রোগীর কিডনি অকেজো হতে পারে। সুতরাং উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত এবং রক্তের ক্রিয়েটিনিন বছরে দুবার পরীক্ষা করতে হবে।

৪. নিয়ন্ত্রিত আহার করা অর্থাৎ কম প্রোটিন গ্রহণ (প্রতিদিন ৪০ গ্রাম এর বেশি নয়)। পনির, চকলেট, কমলা, মাশরুম ইত্যাদি নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করা।

৫. দেহে দেহরস ও ইলেকট্রোলাইট-এর ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের জটিলতা এড়াতে রোগীকে প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবন করতে হবে। যেমন–বৃক্কের সংক্রমণ আরোগ্য লাভের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক সেবন, মূত্র তৈরির জন্য **ডাইইউরেটিক** সেবন, আয়ন ভারসাম্যতার জন্য ওষুধ সেবন ইত্যাদি।

৭. পাতলা পায়খানা, বমি বা জ্বর হলে ঘন ঘন চিনির শরবত বা স্যালাইন পান করতে হবে; প্রয়োজন হলে আইভি স্যালাইন প্রয়োগ করতে হবে।

৮. শরীর সুস্থ ও সচল রাখার জন্য নিয়মিত হাঁটা ও ব্যায়াম, খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

৯. বৃক্ক নিঃসৃত হরমোন **এরিথ্রোপয়েটিন** এবং **ক্যালসিট্রিওল**-এর পরিমাণ প্রয়োজনীয় মাত্রায় দেহে রাখার ব্যবস্থা নেয়া যাতে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক থাকে।

১০. বৃক্ক সম্পূর্ণ বিকল হলে শুধু ওষুধে রোগীকে বাঁচানো সম্ভব না হলে বৃক্ককে **ডায়ালাইসিস** প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা দেয়া, নয়তো সবশেষে **বৃক্ক প্রতিস্থাপন**-এর কথা চিন্তা করতে হবে।

### বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল নির্ণয় (Acute Renal Failure Diagnosis )

রক্ত ও মূত্র পরীক্ষার মাধ্যমে বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল নির্ণয় করা যায়। নিম্নলিখিত কারণে পরীক্ষাগুলো করা হয়-

১. বৃক্ক বিকল হলে রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে যায়।

২. বৃক্ক বিকল হলে রক্তে আয়নের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় কিংবা কমে যায়।

৩. বৃক্ক বিকল হলে রক্তে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ কমে যায়। এ অবস্থাকে **অ্যানিমিয়া** (anemia) বলে।

৪. বৃক্ক বিকল হলে মূত্রের পরিমাণ কমে যায় (<0.5 ml/kg/h for 6 hours)।

## ডায়ালাইসিস (Dialysis)

ডায়ালাইসিস একটি **কৃত্রিম প্রক্রিয়া** যার মাধ্যমে বৃক্ক স্বাভাবিকভাবে কাজ না করলে রক্তে জমে যাওয়া বর্জ্যপদার্থ (ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, পটাসিয়াম) ও অপ্রয়োজনীয় পানি অপসারণ করা হয়। রক্তে রেচন বর্জ্যের বৃদ্ধি পাওয়াকে **অ্যাজোটিমিয়া** (azotimia) বলে। এ অবস্থায় মানুষ দেহে যে অসুস্থতা অনুভব করে তাকে বলে **ইউরেমিয়া** (uremia)। ১৯২৪ সালে জার্মান চিকিৎসক **জর্জ হাস্‌** (Georg Hass) সর্বপ্রথম **ডায়ালাইসিস** প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করেন। বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল চিকিৎসায় দুধরনের ডায়ালাইসিস করা হয়। যথা– **১. হিমোডায়ালাইসিস ও ২. পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো–

**ক. হিমোডায়ালাইসিস (Haemodialysis) :** এ প্রক্রিয়ার শুরুতে কিছু যন্ত্রপাতি, দ্রবণ ও টিউবের সমন্বয়ে একটি **কৃত্রিম বৃক্ক** বা **ডায়ালাইজার** প্রস্তুত করা হয়। কৃত্রিম বৃক্ক আসল বৃক্কের মতো একই নীতি অনুসরণ করে কাজ করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে রক্তকে পাম্প করে শরীর থেকে বের করে বর্জ্যপদার্থ অপসারণের উদ্দেশে পরিস্রুত করে যেভাবে আবার দেহে ফেরত পাঠানো হয় তাকে **হিমোডায়ালাইসিস** বলে। পদ্ধতিটি নিম্নরূপ–

রোগীর দেহে একটি ধমনির ভিতর ফাঁপা নলাকার সূঁচ ঢোকানো হয়। এর নাম **ক্যাথেটার** (catheter)। এটি পিছন দিকে একটি নমনীয় টিউবের সাথে লাগানো থাকে। টিউবটি প্রথমে কিডনি মেশিনের সঙ্গে যুক্ত হয়, পরে একটি শিরায় এসে মিলিত হয়। বাহুর নিম্নপ্রান্ত বা পায়ে ক্যাথেটার লাগানো হয়। যাদের ঘন ঘন ডায়ালাইসিস হয় তাদের ক্ষেত্রে একটি ছোট টিউবসহ ক্যাথেটারটি স্থায়ীভাবে লাগিয়ে রাখা হয়।

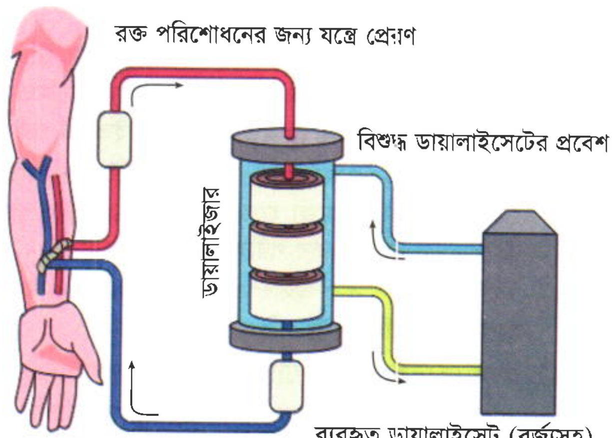

চিত্র ৬.১০ : হিমোডায়ালাইসিস

পাম্পের সাহায্যে সযত্নে ধমনি থেকে রক্ত বের করে শিরার দিকে চালনা করা হয়। রক্তে **হেপারিন** (heparin) মেশানো হয় যাতে জমাট না

বাঁধে। রক্ত ধীরে ধীরে কিডনি মেশিনের **ডায়ালাইসিস দ্রবণ** বা **ডায়ালাইসেট** (dialysate) এ শায়িত টিউবের ভিতর দিয়ে সংবহিত হয়। টিউবগুলো কৃত্রিম **আংশিক ভেদ্য** (partially permeable) ঝিল্লি-নির্মিত যা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অতিক্ষুদ্র অণু ও পানিকে ব্যাপিত হওয়ার সুযোগ দেয়। রক্তকণিকা ও প্রোটিন অণু বড় হওয়ায় ব্যাপিত হতে পারে না।

রক্ত ও ডায়ালাইসেট (ডায়ালাইসিস দ্রবণ)–এর মধ্যে সমতা না আসা পর্যন্ত বিনিময় অব্যাহত থাকে। রক্তের অবাঞ্ছিত বস্তু বিশেষ করে ইউরিয়া ও অতিরিক্ত সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি অপসারিত হয়, প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে যায়।

প্রতি সপ্তাহে রোগীকে দুবার বা তিনবার হিমোডায়ালাইসিসের সম্মুখীন হতে হয়। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে ৪-৫ ঘন্টা সময় লাগে। প্রতিবার সদ্য বানানো ডায়ালাইসেট ব্যবহার করতে হয়।

***

**ডায়ালাইসেটের উপাদান :** হিমোডায়ালাইসিসের উদ্দেশে ডায়ালাইসিস টিউবগুলোকে যে দ্রবণে রাখা হয় তাকে **ডায়ালাইসেট** বলে। এর উপাদনগুলো হচ্ছে- সঠিক তাপমাত্রা (স্থির দেহ তাপমাত্রা); সঠিক আয়নিক ভারসাম্য, বিশেষ করে $Na^+$, $K^+$, $Cl^-$, $Mg^{2+}$, $Ca^{2+}$ ও $HCO_3^-$ (এসিটেট রূপে); অতিরিক্ত পুষ্টি, যেমন গ্লুকোজ; সঠিক pH ও বাফারিং ক্ষমতা (buffering capacity) ইত্যাদি।

সতর্কতা : রক্ত ডায়ালাইসেট দ্রবণে চালনা করার সময় কতকগুলো বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। ডায়ালাইসেট দ্রবণকে সামান্য উষ্ণ করা হয় যাতে এর উষ্ণতা রক্তের উষ্ণতার সঙ্গে সমান হয়। তাছাড়া ডায়ালাইসেট দ্রবণ ও রক্তের চাপের যাতে তারতম্য সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। চাপের তারতম্য ঘটলে অংশিকভেদ্য ঝিল্লি ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

**খ. পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস (Peritonial dialysis) :** কৃত্রিম ঝিল্লির পরিবর্তে দেহে অবস্থিত **পেরিটোনিয়াল ঝিল্লি** (পেরিটোনিয়াম)-কে ডায়ালাইসিং ঝিল্লি হিসেবে ব্যবহার করে বৃক্কের ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়াকে **পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস** বলে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে রোগীর উদর প্রাচীরে একটি ছোট চেরাছিদ্র করে তার ভিতর দিয়ে সরু প্লাস্টিক টিউব উদরীয় গহ্বরে প্রবেশ করানো ও স্থায়ীভাবে রেখে দেয়া হয়। উদরীয় গহ্বরের প্রাচীরটি **পেরিটোনিয়াম** যা আংশিক ভেদ্য এবং **ডায়ালাইসিং ঝিল্লি** হিসেবে কাজ করে। প্লাস্টিক টিউবের ভিতর দিয়ে ডায়ালাইসেট উদরীয় গহ্বরে প্রবেশ করিয়ে কয়েক ঘন্টা রেখে দেয়া হয়। ডায়ালাইসেট ও উদরের বাকি অংশের টিস্যু-তরলের মধ্যে উপাদানের বিনিময় ঘটে। দিনে ৩-৪ বার ডায়ালাইসেট প্রতিস্থাপন করা যায়।

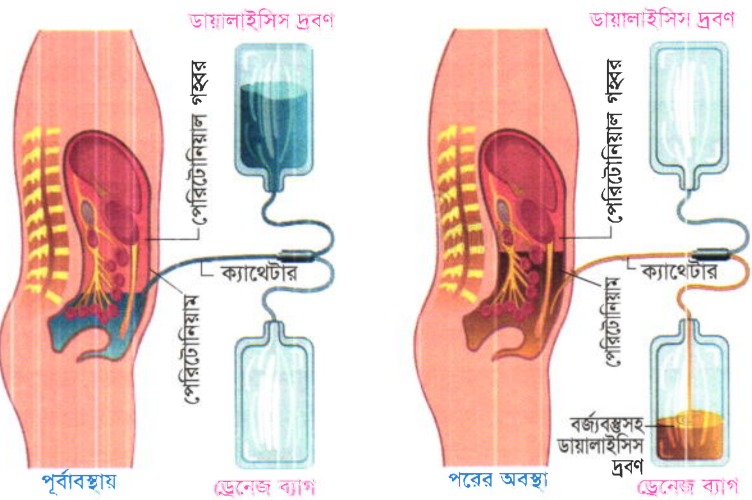


চিত্র ৬.১১ : পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়া

## বৃক্ক প্রতিস্থাপন (Kidney Transplant)

বৃক্ক বিকলের দীর্ঘকালীন সমাধানে রোগীর দেহে ভিন্ন ব্যক্তির সুস্থ ও সঠিক বৃক্ক স্থাপনকে **বৃক্ক প্রতিস্থাপন** বলে। বৃক্ক বিকলের চিকিৎসায় ডায়ালাইসিস পদ্ধতি সাময়িক সমাধান হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যয় সাপেক্ষ মনে হলেও দীর্ঘকালীন হিসেবে বৃক্ক প্রতিস্থাপনই ভালো পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হচ্ছে। স্থায়ীভাবে নষ্ট বৃক্কের বিকল্প হিসেবে একটি সুস্থ বৃক্ক প্রতিস্থাপনই স্থায়ী সমাধান হতে পারে।

**বৃক্ক প্রতিস্থাপন** একটি আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে রোগীর দেহে অন্য কারো দান করা বৃক্ক স্থাপন করা হয় এবং বিকল বৃক্কটি অপসারণ করা হয় অথবা বিকল বৃক্ক থেকে কোনো রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা না থাকলে বৃক্কটি রেখে দেয়া হয়। বৃক্ক প্রতিস্থাপনের সময় প্রথমে রোগীর শ্রোণিদেশে অপারেশনের মাধ্যমে দান করা বৃক্কটি স্থাপন করা হয়। নতুন বৃক্কের ধমনি ও শিরাকে রোগীর ধমনি ও শিরার সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়। নতুন বৃক্কের ইউরেটার পৃথকভাবে মূত্রথলির সাথে জুড়ে দেয়া হয়।

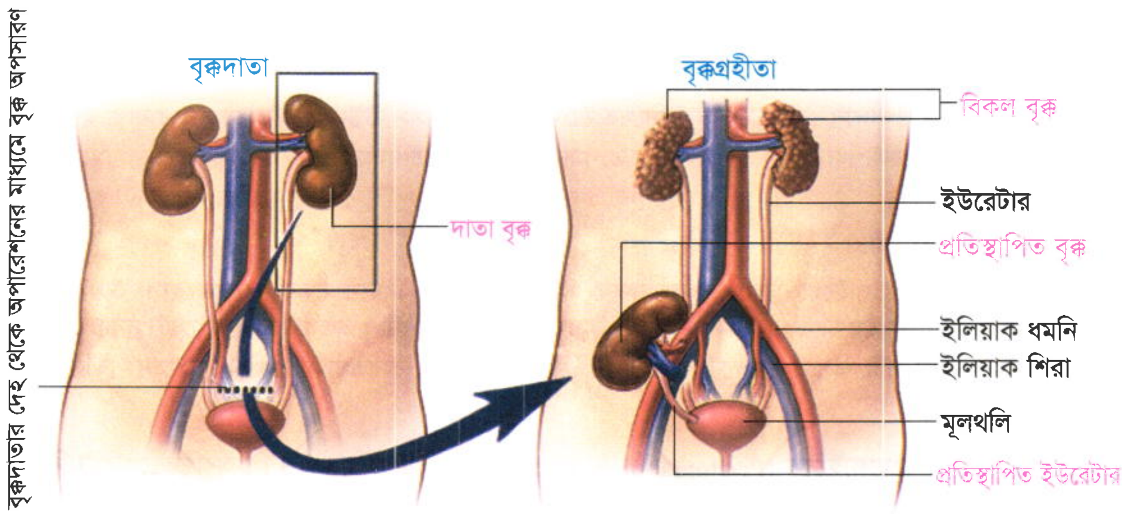


চিত্র ৬.১২ : বৃক্ক প্রতিস্থাপন

### বৃক্ক প্রতিস্থাপনে অবশ্য স্মরণীয় বিষয় হচ্ছে–

[MAT 16-17] ১. বৃক্কদাতা (অনাত্মীয় বা আত্মীয়) যেই হোক না কেন তার দেহ থেকে সংগ্রহের ঠিক ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রোগীর দেহে স্থাপন করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে যতখানি সময় বৃক্কটি বাইরে থাকে ততক্ষণ বৃক্কের উপর দিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে ঠান্ডা স্যালাইন দ্রবণ প্রবাহিত করা হয়। দাতা মৃত হলে সদ্যমৃত দাতার দেহ থেকে বৃক্ক সংগ্রহ করতে হবে।

২. সংগৃহীত বৃক্কটি সুস্থ হতে হবে (HIV বা অন্যান্য সংক্রমণমুক্ত হতে হবে)।

৩. বৃক্কদাতা ও গ্রহীতার ব্লাড গ্রুপ এবং টিস্যুর ধরণ এক হতে হবে।

### বৃক্ক প্রতিস্থাপন-পরবর্তী যত্ন কেমন হওয়া উচিত ?

বৃক্ক প্রতিস্থাপন পরবর্তী যত্নের ওপর নির্ভর করে তা কত দিন কার্যকর থাকবে। প্রতিস্থাপিত বৃক্কের সঠিক যত্ন নিলে ১৫-২০ বছর কোনো সমস্যা ছাড়াই সেবা দেবে। নিয়মিত শৃঙ্খলার সঙ্গে ওষুধ সেবন, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ অন্যান্য রোগ, যা বৃক্ককে দুর্বল করতে পারে, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা ও নিয়মিত ফলোআপ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাবারে পরিমিত লবণ, পরিমিত পানি পান ও চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করা; নিয়মিত মাস্ক পরা, বেশি ভিড় এড়িয়ে চলা ও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ সেবন করা উচিত নয়।

## হরমোনাল ক্রিয়া (Hormonal Activities)

উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি শারীরবিজ্ঞানী **ক্লড বার্নার্ড** (Claude Bernard) সর্বপ্রথম প্রাণিদেহের অন্তঃস্থ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কৌশলের উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে মানবদেহে মূত্রের ঘনত্ব, রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা ও রক্তের পিএইচ নিয়ন্ত্রণে মূল কার্যকর উপাদান হিসেবে **হরমোন** কিভাবে জটিল ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে চলেছে বিজ্ঞানীরা তা উদ্ভাবন করেছেন। নিচে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

### মূত্রের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ (Control of Urine Concentration)

আহারের সঙ্গে পানি গ্রহণ এবং ঘাম, মল-মূত্র ত্যাগ ইত্যাদির মাধ্যমে পানি ত্যাগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহ রক্তের **দ্রব** (solute)-এর স্থিতাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রভাব ফেলে অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন (ADH)। বিপুল পরিমাণ কম ঘন মূত্র উৎপাদন প্রক্রিয়া **ডাইইউরেসিস** (diuresis) এবং এর বিপরীত প্রক্রিয়াটি স্বভাবতই **অ্যান্টিডাইইউরেসিস** (antidiuresis) নামে পরিচিত। ADH কার্যগতভাবে অ্যান্টিডাইইউরেটিক, অতএব বেশি ঘন মূত্র উৎপন্নে ভূমিকা পালন করে। ADH একটি পেপটাইড হরমোন। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে উৎপন্ন হয়ে ADH পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাৎখন্ডে প্রবেশ করে। রক্তে পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত অসমোরিসেপ্টর কোষগুলো উত্তেজিত হয় এবং ADH উৎপন্ন করে। নিউরোনের অ্যাক্সন বেয়ে ADH পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থিতে প্রবেশ করে এবং রক্তস্রোতে ক্ষরিত হয়। ক্ষরিত হরমোন বৃক্কসহ দেহের সব অংশে বাহিত হয়।

বৃক্কে নেফ্রনগুলোর সংগ্রাহী নালির কোষঝিল্লিতে অবস্থিত গ্রাহক অণু ADH গ্রহণ করে, ফলে ঝিল্লির পানিভেদ্যতা বেড়ে যায়। গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট থেকে তখন পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বৃক্কের সংগ্রাহী নালিতে পুনঃশোষিত হয়। সংগ্রাহী নালিতে তরল বেশ ঘন হয়ে যায় এবং ব্যক্তি অল্প পরিমাণ অতিঘন মূত্র উৎপন্ন করে।

অন্যদিকে, রক্তে পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে হাইপোথ্যালামাসের অসমোরিসেপ্টর কোষগুলো তেমন উত্তেজিত হয় না এবং অতি অল্প পরিমাণ ADH ক্ষরিত হয়। তখন সংগ্রাহী নালির কোষগুলো প্রায় পানি-অভেদ্য হয়ে যায়, ফলে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট থেকে পানি পুনঃশোষণ বন্ধ থাকে। সংগ্রাহী নালিতে তখন ফিল্ট্রেট অনেক তরল হয়ে যায় এবং ব্যক্তি বেশি পরিমাণ অতি তরল মূত্র উৎপন্ন করে। দেহে পানির সমতা ফিরে না আসা পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। রেনাল ক্যাপসুলে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া সবসময় অব্যাহত থাকে। পানির অভাবে রক্তরসের গাঢ়তা বাড়লে কিংবা পরিমাণ কমে গেলে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত **অ্যালডোস্টেরন** (aldosterone) হরমোন মূত্রে সোডিয়াম আয়নের রেচন কমিয়ে পরোক্ষভাবে পানির রেচনও হ্রাস করে।

### রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Control of Sodium in Blood)

[DAT 19-20] রক্তের প্লাজমায় সোডিয়ামের মাত্রা স্থির রাখতে যে হরমোনটি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে সেটি হচ্ছে **অ্যালডোস্টেরন** (aldosterone)। এ হরমোনও পানি পুনঃশোষণকে প্রভাবিত করে। অ্যালডোস্টেরন ক্ষরিত হয় অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স (বহিঃস্থ) অঞ্চল থেকে।

রক্তে সোডিয়াম কম হলে অভিস্রবণের মাধ্যমে কম পানি প্রবেশ করে, তাই রক্তের আয়তন কমে যায়। এর ফলে রক্তচাপও হ্রাস পায়। চাপ ও আয়তন হ্রাস পেলে ডিস্টাল বা দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা ও অ্যাফারেন্ট ধমনিকার (afferent arteriole) মাঝখানে অবস্থিত **জাক্সটাগ্লোমেরুলার কমপ্লেক্স** (juxtaglomerular complex) নামে একগুচ্ছ সংবেদী কোষ উদ্দীপ্ত হয় এবং **রেনিন** (renin) এনজাইম ক্ষরণ করে। যকৃত থেকে উৎপন্ন ও প্লাজমায় অবস্থিত একধরনের প্রোটিনকে রেনিন সক্রিয় করে **অ্যানজিওটেনসিন** (angeotensin) হরমোনে পরিণত করে। এ হরমোন অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে অ্যালডোস্টেরন ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে। অ্যালডোস্টেরন রক্তবাহিত হয়ে বৃক্কের ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকায় পৌঁছায় এবং নালিকার কোষগুলোতে **সোডিয়াম-পটাসিয়াম পাম্প** (sodium-potassium pump)-কে উদ্দীপ্ত করে। ফলে দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা থেকে সোডিয়াম আয়ন বেরিয়ে নালিকার চারপাশের কৈশিকজালিকায় প্রবেশ করে। অন্যদিকে, পটাসিয়াম আয়ন প্রবেশ করে কৈশিকজালিকা থেকে দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকায়। অ্যালডোস্টেরন অন্ত্রে সোডিয়াম শোষণকে এবং ঘামে কম সোডিয়াম ত্যাগকে উদ্দীপ্ত করে। এ দুই প্রক্রিয়ার ফলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। এ কারণে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রচুর পানি প্রবেশ করে রক্তের আয়তন ও চাপ উভয়ই বেড়ে যায়।

## রক্তের পিএইচ নিয়ন্ত্রণ (Control of Blood $p^H$)

**পিএইচ** ($p^H$) হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বের একটি পরিমাপক। নিরপেক্ষ $p^H$ হচ্ছে 7.0, এসিড $p^H$ হয় 7-এর নিচে, আর ক্ষারীয় $p^H$ হছে 7-এর উপরে। কিছু রাসায়নিক পদার্থ দ্রবণে $p^H$-এর পরিবর্তনকে প্রতিহত করতে সক্ষম। এসব পদার্থকে বলে **বাফার** (buffers)। রক্তের প্লাজমার স্বাভাবিক $p^H$ হচ্ছে 7.4 (7.35-7.45) [MAT 12-13]। এ মাত্রা যথাসম্ভব বজায় না রাখলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

দেহে ক্ষারের চেয়ে এসিড বেশি উৎপন্ন হয়। অতএব, এসিডিটি কমানোর বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। এসিডিটি বেড়ে যাওয়ার একটি কারণ হচ্ছে কোষীয় শ্বসনে উৎপন্ন $CO_2$। এটি দ্রবীভূত হয়ে $H_2CO_3$ (কার্বনিক এসিড) নামে একটি দুর্বল এসিডে পরিণত হয়। এটি ভেঙ্গে $H^+$ ও $HCO_3^-$ (হাইড্রোজেন কার্বনেট আয়ন) উৎপন্ন হয়। $CO_2$ এর ঘনত্ব বেশি হয়ে গেলে পরিত্রাণ পেতে প্রতিবর্ত সাড়া হিসেবে শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়। $HCO_3^-$ বাফার হিসেবে কাজ করতে পারে কারণ $H^+$ এর ঘনত্ব বেশি হয়ে গেলে এগুলো $H_2CO_3$ গঠন করে।

রক্তে $HCO_3^-$ ও ফসফেট বাফার অতিরিক্ত $H^+$ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ কারণে রক্তের $p^H$ কমে না। প্লাজমার স্বাভাবিক $p^H$ এ যেন পরিবর্তন না ঘটে সে উদ্দেশে নেফ্রনের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা এবং সংগ্রাহী নালি নিম্নোক্ত দুভাবে কাজ করে।

১. রক্ত অতিএসিডিক হতে শুরু করলে দূরবর্তী নালিকা ও সংগ্রাহী নালির কোষগুলোর সাহায্যে রক্ত থেকে $H^+$ সক্রিয় পরিবহন (active transport)-এর মাধ্যমে নালিকাতে পরিবাহিত হয়। $CO_2$ যদি $H^+$ এর উৎস হয়ে থাকে তাহলে $HCO_3^-$ ও উৎপন্ন হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তে ফেরত যাবে। $p^H$ বেড়ে গেলে বিপরীত ঘটনা ঘটবে। এসব পরিবর্তনের কারণে মূত্রের $p^H$ 4.5 – 8.5 পর্যন্ত হতে পারে।

২. $p^H$ কমে গেলেও বৃক্ককোষে অ্যামোনিয়াম বেইস (base) আয়ন ($NH_4^+$) সৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত হয়। $NH_4^+$ এসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃক্কে বাহিত হয় এবং অ্যামোনিয়াম লবণ হিসেবে রেচিত হয়।

### ব্যবহারিক

### বৃক্কের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

বৃক্কের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণে নিচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাবে।

১. বাইরে কর্টেক্স ও ভিতরে **মেডুলা**-এ দুটি অংশ নিয়ে গঠিত।

২. এতে অসংখ্য প্যাঁচানো নালিকা বা **নেফ্রন** অবস্থিত।

৩. প্রত্যেক নেফ্রনের অগ্রভাগে একটি করে পেয়ালার মতো গঠন রয়েছে। এর নাম **বোম্যানস ক্যাপসুল**। পেয়ালার অভ্যন্তরে **গ্লোমেরুলাস** নামক একগুচ্ছ কৈশিকনালি রয়েছে।

৪. নেফ্রনের ফাঁকে ফাঁকে **মেডুলারি রশ্মি** অবস্থিত।

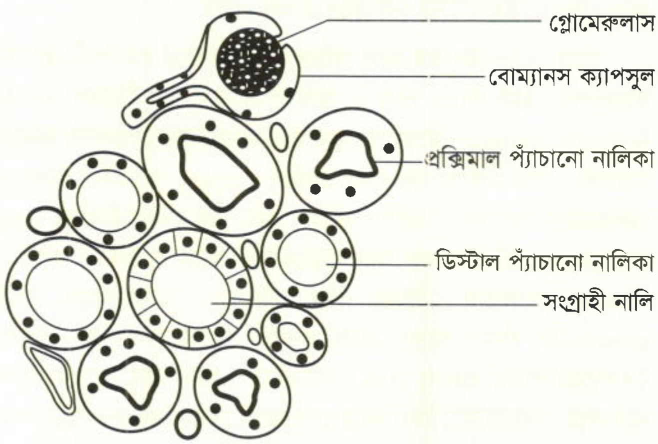


চিত্র ৬.১৩ : বৃক্কের অনুচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

## এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. কোষীয় বিপাকের (অপচিতিমূলক) ফলে সৃষ্ট নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে রেচন (excretion) বলে।

২. আমিষের বিপাকের ফলে প্রাণিদেহে নাইট্রোজেনঘটিত যেসব বর্জ্যপদার্থ সৃষ্টি হয় তাকে রেচন পদার্থ বলে। মানুষের প্রধান রেচনপদার্থ হলো– অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ইত্যাদি।

৩. মানুষের বৃক্কের সংখ্যা দুটি। ডান বৃক্ক বাম বৃক্কের সামান্য নিচে অবস্থিত কারণ ডান দিকের যকৃত বৃক্ককে নিচে ঠেলে রাখে।

৪. বৃক্কের গঠন ও কাজের একককে নেফ্রন বলে। মানুষের প্রতিটি বৃক্কে ১০ থেকে ১২ লক্ষ নেফ্রন থাকে।

৫. বৃক্কের কর্টেক্স অঞ্চলে অবস্থিত 0.2 মিলিমিটার ব্যাসের গোলাকার অংশকে রেনাল করপাসল বা ম্যালপিজিয়ান বডি বলে।

৬. রেনাল ধমনি থেকে সৃষ্ট ক্ষুদ্র অন্তর্বাহী ধমনিকা নেফ্রনের বোম্যানস ক্যাপসুলে প্রবেশ করে যে কৈশিকজালিকাসমৃদ্ধ জটিল গঠন সৃষ্টি করে তার নাম গ্লোমেরুলাস।

৭. নেফ্রনের নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকার শেষ প্রান্ত সোজা হয়ে বৃক্কের মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি U আকৃতির ফাঁস বা লুপ গঠন করে পুনরায় কর্টেক্স অঞ্চলে ফিরে আসে। আবিষ্কারক জার্মান চিকিৎসক Jakob Henle-র নামানুসারে একে হেনলির লুপ বলা হয়।

৮. নেফ্রনের রেনাল করপাসল বা ম্যালপিজিয়ান বডিতে যে পদ্ধতিতে রক্ত থেকে পানি, রেচন বর্জ্য ও অন্যান্য পদার্থ পরিস্রুত হয় তাকে অতিপরিস্রাবণ বা আল্ট্রাফিল্ট্রেশন বলে।

৯. বোম্যানস ক্যাপসুল এ জমাকৃত পরিস্রুত তরল গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেটে বিদ্যমান প্রয়োজনীয় বস্তু যেমন-- পানি, গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ভিটামিন, খনিজ লবণ, আয়ন প্রভৃতি রক্তের মাধ্যমে পুনঃশোষণকে নির্বাচিত পুনঃশোষণ বলে।

১০. দেহে অব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড বিশ্লিষ্ট হয়ে যে অ্যামোনিয়া তৈরি করে তা বিষাক্ত। অ্যামোনিয়া $CO_2$ এর সাথে মিলিত হয়ে যকৃতে অরনিথিন চক্রের মাধ্যমে কম ক্ষতিকারক ও পানিতে দ্রবণীয় ইউরিয়ায় পরিণত হয়। ইউরিয়া প্লাজমায় (রক্তরসে) অবস্থান করে এবং সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছে।

১১. যেসব প্রাণীর রেচনে ইউরিয়ার পরিমাণ সর্বাধিক থাকে তাদের ইউরিওটেলিক প্রাণী বলে। যেমন-মানুষ।

১২. নেফ্রনের রেনাল টিউবিউলসে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট এর নির্বাচিত পুনঃশোষণের পর যে খড় বর্ণের, তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ও অম্লধর্মী তরল রেচনবর্জ্য মূত্রথলিতে জমা হয় তাকে মূত্র বলে। ইউরোক্রোম নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় মূত্রের রঙ খড় বর্ণের (হালকা হলুদ) হয়।

১৩. বৃক্ক দেহের পানি ও সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ক্লোরাইড আয়নের মধ্যে আন্তঃসাম্য রক্ষা তথা অসমোরেগুলেশন (osmoregulation)- এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহস্থ তরল পদার্থ এবং দ্রবীভূত লবণসমূহের ঘনত্বের উপর অভিস্রবণ প্রক্রিয়া নির্ভর করে। মূত্রের সঠিক পরিমাণ বজায় রেখে বৃক্ক দেহ তরলের পরিমাণ ও অভিস্রবণিক চাপকে নিয়ন্ত্রণ করে।

১৪. একজন সুস্থ মানুষের হঠাৎ করে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বৃক্কের কার্যক্রম কমে গেলে অথবা বন্ধ হয়ে গেলে তাকে বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল বা অ্যাকিউট রেনাল ফেইলিউর বলে। বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলে মূত্রের পরিমাণ কমে যায় এবং রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়।

১৫. বৃক্ক সম্পূর্ণভাবে অকেজো হওয়ার পর শরীরে জমে থাকা বর্জ্য (ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, পটাসিয়াম) পরিশোধিত করার নাম ডায়ালাইসিস।

১৬. পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে ADH ক্ষরণ কমে গেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে বৃক্ক নালিকায় পানি শোষণ ব্যহত হয় এবং মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে অধিক পরিমাণ মূত্র ত্যাগ ঘটে। এ অবস্থাকে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস বলে। উল্লেখ্য এ রোগে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে না এবং মূত্রে শর্করা নির্গত হয় না। ইনসুলিন হরমোনের অভাবে যে বহুমূত্র হয় তাকে মধুমেহ বা ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে। এতে মূত্রের সাথে শর্করা নির্গত হয়।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নারীদেহে বৃক্কের ওজন–
ক) ১২০ – ১৩০ গ্রাম খ) ১৪০ – ১৫০ গ্রাম
গ) ৫০ – ১৭০ গ্রাম ঘ) ১৩০ – ১৫০ গ্রাম

২. দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা থেকে কোন আয়ন বেরিয়ে কৈশিকনালিকায় প্রবেশ করে ?
ক) সোডিয়াম আয়ন খ) পটাসিয়াম আয়ন
গ) ক্লোরাইড আয়ন ঘ) হাইড্রোজেন আয়ন

৩. মূত্রের $p^H$ হলো–
ক) 4.5 – 8.0 খ) 5.5 – 7.5 গ) 4.6 – 8.7 ঘ) 3.5 – 5.5

৪. কিটো এসিড ব্যবহৃত হয়–
ক) শক্তি উৎপাদনে খ) শর্করা বিপাকে
গ) $NH_3$ তৈরিতে ঘ) দেহ গঠন ও বৃদ্ধিতে

৫. মানবদেহে প্রতিবৃক্কে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ কত ml ?
ক) 1200 ml খ) 800 ml গ) 600 ml ঘ) 1000 ml

৬. হেনলীর লুপে পুনঃশোষিত হয় কোনটি ?
ক) ফসফেট খ) ম্যাগনেসিয়াম
গ) ক্লোরিন আয়ন ঘ) বাইকার্বনেট

৭. দুই রেনাল পিরামিডের কর্টেক্সের কোন অংশ স্তম্ভের মতো মেডুলার গহ্বরে প্রবেশ করে ?
ক) রেনাল স্তম্ভ খ) রেনাল কলাম
গ) রেনাল পেলভিস ঘ) রেনাল পিরামিড

৮. বৃক্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. শিম বীজের মত ii. পার্শ্বদেশ উত্তল
iii. ভিতরের দিক অবতল
**নিচের কোনটি সঠিক ?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯. টিউবিউলের প্রাচীরের কোষগুলো বিশেষভাবে অভিযোজিত কারণ–
i. সাইটোপ্লাজমে বেশি গলজিবস্তু থাকে
ii. রক্তের কৈশিকজালিকার সাথে ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে
iii. কোষগুলোর শোষণতল বেশি
**নিচের কোনটি সঠিক ?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০. মানুষের বৃক্কের ক্ষেত্রে রেনাল করপাসলের কাজ–
i. রক্তের অতিপরিস্রাবণ
ii. পরিস্রুত তরলের পুনঃশোষণ
iii. ক্লোরিন আয়নের পুনঃশোষণ
**নিচের কোনটি সঠিক ?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১. বৃক্ক বিকলের লক্ষণ–
i. উচ্চ রক্তচাপ ii. অনেকক্ষণ ধরে হেঁচকি তোলা
iii. শরীর ফুলে যাওয়া
**নিচের কোনটি সঠিক ?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২. আল্ট্রাফিল্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যে যুক্তিগুলো সঠিক–
i. মূত্র তৈরীর ১ম ধাপ
ii. ইউরিয়া প্লাজমায় অবস্থান করে
iii. রক্ত অতি উচ্চচাপে গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করে
**নিচের কোনটি সঠিক ?**
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

মিতুল ক্লাসে রেচনতন্ত্র পড়ার সময় দেখল পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে একধরনের রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরিত হয়, যা রক্তে প্রবাহিত হয়।

১৩. উদ্দীপকে যে রাসায়নিক পদার্থ নির্দেশ করা হয়েছে –
ক) TSH খ) ADH গ) LH ঘ) FSH

১৪. উদ্দীপকের রাসায়নিক পদার্থের ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত–
i. রক্তে $H_2O$ কমলে অধিক হরমোন ক্ষরিত হবে
ii. রক্তে $H_2O$ বাড়লে কম হরমোন ক্ষরিত হবে
iii. $Na^+$ রেচন বাড়িয়ে দেয়
**নিচের কোনটি সঠিক ?**
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**উত্তরমালা**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১. ঘ | ২. ক | ৩. ক | ৪. ক | ৫. গ |
| ৬. গ | ৭. খ | ৮. ঘ | ৯. গ | ১০. ক |
| ১১. ঘ | ১২. খ | ১৩. খ | ১৪. ক | |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শরীফ সাহেবের শরীর ফুলে যায়, প্রস্রাবে যন্ত্রনা হয়। এজন্য ডায়ালাইসিস করান। শরীফ সাহেবের স্ত্রী জার্মান প্রবাসী ডাঃ ছেলেকে ফোনে বিস্তারিত জানালেন। মায়ের কথা শুনে ছেলে জানালো, "আমি টাকা পাঠাচ্ছি। আব্বুকে আর ডায়ালাইসিস না করিয়ে বৃক্ক প্রতিস্থাপন করলে আব্বু স্থায়ীভাবে সুস্থ থাকবেন।"

ক) ইউরিওটেলিজম কী ? ১
খ) অসমোরেগুলেশন বলতে কী বুঝ ? ২
গ) উদ্দীপকে যে অঙ্গটি নির্দেশ করে তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ) উদ্দীপকে স্থায়ী সুস্থতার জন্য যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তার পক্ষে করণীয় পদক্ষেপ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ৪